নবাগত

দু'দিন থেকে জিনিসপত্র গুছনো চললো। পাড়ার মধ্যে আছে মাত্র তিনঘর প্রতিবেশী —কারো সঙ্গে কারো কথাবার্ত্তা নেই। পাড়ার চারিধারে বনজঙ্গল, পিটুলি গাছ, তেঁতুল গাছ, বাঁশঝাড়, বহু পুরনো আমকাঁঠালের বাগান। দ্রব ঠাকরুণের বাড়ীর চারিধার বনে বনে নিবিড়, সূর্যের আলো কস্মিন্‌কালে ঢোকে না, তার ওপর বাড়ীর সামনে একটা ডোবা, বর্ষার জলে টইটম্বুর, দিনরাত 'ঘাঁওকো' 'ঘাঁওকো', ব্যাঙের একঘেয়ে ডাক, দিনে রাতে মশার বিন্‌বিন্‌ুনি।

দ্রব ঠাকরুণের নাতি বল্লে—ঠাকুমা, সাবু আছে ঘরে, না বাজার থেকে আনবো?

দ্রব ঠাকরুণের কণ্ঠস্বর অতি ক্ষীণ শোনাল, কারণ আজ দু'মাস কাল তিনি ম্যালেরিয়ায় ভুগছেন—পালাজ্বর, ঘড়ির কাঁটার নিয়মে তা আসবে একদিন অন্তর অন্তর ঠিক বিকেল বেলাটিতে। দ্রব ঠাকরুণ পুরোনো কাঁথা-লেপ চাপা দিয়ে পড়বেন, উঃ আঃ করবেন—জ্বরের ধমকে ভুল বকবেন।

ও বাড়ীর ন' ঠাকরুণ এসে জিজ্ঞেস করবেন জানালার কাছে দাঁড়িয়ে—বলি ও দিদি, অমন করচ কেন? জ্বর এল নাকি?

—আর ন'বৌ। মলেই বাঁচি। নিত্যি জ্বর, নিত্যি জ্বর—ওরে মা রে, হাত-পা কি কামড়ানটা কামড়াচ্ছে! ··একটু উঠে হেঁটে বেড়াতে দেবে না—এ কি কাণ্ড, হ্যাঁ গা?

পরে মিনতির সুরে বললেন—ও ন'বৌ, নক্ষী দিদি, শীত তো আজ ভাঙলো না, কাঁথা গায়ে দিইচি, লেপ গায়ে দিইচি—তুমি ওই বাঁশের আল্‌নায় পুরনো তোশকটা পেড়ে আমার গায়ে যদি দিয়ে যাও—

—চেপে ধরবো, হ্যাঁ দিদি?

—ধ-রো—ন'বৌ—চেপে ধ-রো—আমার হ-য়ে গেল!

—ভয় কি, অমন ক'রো না, ছিঃ। টেবু আসবে চিঠি পেলেই, কাঁদু আসবে, বিন্দে আসবে —তোমার নাতিরা বেঁচে থাক্, অমন সোনার চাঁদ নাতি সব, ভাবনা কি তোমার দিদি?

—কে-উ—আ-মা কে—দে-খে-না—ন-বৌ—

—কেন দেখবে না দিদি—সবাই দেখবে। তুমি বেশি বোকো না, চুপটি করে শুয়ে থাকো—

—আমার গো-রু! গো-রু উ-ত্ত-র-মা-ঠে—

—কোথায় গোরু দিয়ে এসেছিলে?

—জ-টে গ-য়-লা-র জ-ড়-ল কে-তে-র পাশে—

—আচ্ছা আমি এনে দেবো এখন গোরু। আমারও গোরু রয়েচে জটে গোয়ালার জমির কাছেই। তুমি শুয়ে থাকো।

আরও ঘণ্টা খানেক পরে বৃদ্ধা ন'ঠাকরুণ আবার এসে জানালায় দাঁড়িয়ে বল্লেন—কম্প থেমেচে দিদি ?

ক্ষীণস্বরে লেপ কাঁথার ছেঁড়া স্তূপের মধ্যে থেকে জবাব এল—গরু ! আমার গোরু তো—

—কোনো ভয় নেই। সে আমি এনেচি। কম্প থেমেচে ?

—হুঁ।

সারা বর্ষা দ্রবময়ী এমনি ম্যালেরিয়ায় ভোগেন। তাঁর বড় নাতি শ্রীশচন্দ্র ওরফে টেবু কাজ করে ইছাপুরে বন্দুকের কারখানায়, মেজ নাতি পাকৃশীতে ই. বি. আর-এ—ছোট নাতিও ওদিকে যেন কোথায় থাকে। বড় নাতি ছাড়া অন্য দুটি অবিবাহিত, বড় নাতির আবার একটি ছেলেও হয়েচে। আজ বছর পাঁচ-ছয় আগে বড় নাতি ছেলে বৌ নিয়ে বাড়ী এসে দিন সাতেক ছিল। নাতবৌ মনোরমা হুগলী জেলার মেয়ে, সে এখানে এসে নাক সিঁটকে থাকে, 'বাড়ী তো ভারি, মোটে একখানা চালাঘর, ছেঁচার বেড়া, এমনিধারা জঙ্গল যে, দিনমানেই বুনো শুওর লুকিয়ে থাকে—মশার তো ঝাঁক। মাগো, কি কাদা ঘাটের পথে ! এখেনে কি মানুষ থাকে নাকি ?' মনোরমার খাঁড়ার মত নাক আরও উঁচু ও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। সাতদিন পরে দ্রবময়ীকে নাতির ছেলে খোকন্‌মণির মায়া কাটাতে হয়। তাঁর চোখের জলে বুক ভেসে যায়।

ন'ঠাকরুণকে বলেন—সুদের সুদ, ও যে কি মিষ্টি তা তোমাকে কি বোঝাব ন'বৌ—

দ্রবময়ীর আকুল ক্রন্দনের মধ্যে যে কত কালের পিপাসিত প্রতীক্ষা সুদূর ভবিষ্যতের দিকে নিষ্পলকে চেয়ে আছে, স্বামিহীনা বন্ধ্যা বিধবা ন'ঠাকরুণ তা বুঝতে না পেরে কেমন অবাক হয়ে যান, হয়তো বা ভাবেন—দিদির সবই বাড়াবাড়ি !

ন'ঠাকরুণ আপনার জন কেউ নয়—পাড়ার পাশের বাড়ীর প্রতিবেশিনী মাত্র। বছরের মধ্যে গড়ে তিন-চার মাস দুই বুদ্ধার মধ্যে কথাবার্ত্তা বন্ধ হয়ে যায়, মুখ দেখাদেখি থাকে না —তবুও ঝগড়া কেটে গেলে পাড়ার মধ্যে একমাত্র ন'ঠাকরুণই দ্রবময়ীকে দেখাশুনা করেন সব চেয়ে বেশি, জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে থাকলে তাঁর গোরুটাও নিজের গোরু দুটোর সঙ্গে মাঠে বেঁধে দিয়ে আসেন, একটু সাবু হয়তো করে নিয়ে আসেন, অন্তত জানালায় উঁকি মেরে দু'-একটা কথাও বলেন !

কিন্তু এবার দ্রবময়ী যেন ভুগচেন একটু বেশি।

আষাঢ় মাসের প্রথম থেকে জ্বর শুরু হয়েচে, মাঝে মাঝে প্রায়ই ভোগেন।

শরীর দুর্ব্বল হয়ে পড়েচে—ঘোর অরুচি তার ওপর। পালাজ্বরে ধরেচে আজ মাসখানেক।

সন্ধ্যার দিকে দ্রবময়ী লেপ তোশক ফেলে ঝেড়ে উঠলেন। পালাজ্বরের কম্প থেমে গিয়েচে। জ্বর যদিও এখনো যায় নি—মুখ তেতো, মাথা ভার, শরীর ঝিম্ ঝিম্ করচে।

ডাক দিলেন—ও ন'বৌ, গোরু এনেচ দিদি ?

দু'তিনবার ডাকের পর ন'ঠাকরুণ উত্তর দিলেন—কে ডাকে ? দিদি ? ঠেলে উঠেচ ?

—বলি আমার গরুভো কি এনেচ মাঠ থেকে ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। গোরু গোরু করেই ম'লে শেষকালভা ? জ্বর ছেড়েচে ?

—ছেড়েচে—ছেড়েচে। বলি গোরু কোথায় বেঁধে রাখলে ?

—গোয়ালে গো গোয়ালে—ক্ষেপলে যে গোরু গোরু করে—

কেরোসিন তেল একটা টেমিতে একটুখানি ছিল, দ্রব ঠাকরুণ টেমিটা জ্বালালেন। আমড়া গাছে একটা তেড়ো পাখী আর একটা তেড়ো পাখীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইচে। দ্রব ঠাকরুণের জ্বরতপ্ত মস্তিষ্কে মনে হ'ল পাখী দুটো বলচে :—

প্রথম। কুৎলি, কুৎলি—

দ্বিতীয়। কাঁ্যা-কাঁ্যা-কাঁ্যা—

প্রথম। কুৎলি, কুৎলি—

দ্বিতীয়। কাঁ্যা-কাঁ্যা-কাঁ্যা—

প্রথম। কুৎলি, কুৎলি—

দ্রব ঠাকরুণ বিরক্ত হয়ে উঠলেন। কি একঘেয়ে আওয়াজ রে বাপু। চালাচ্চে তো চালাচ্চেই, আধঘণ্টা হয়ে গেল—একে মাথা ধরে আছে, ভালো লাগে ? থাম্ না বাপু। মানুষে জানোয়ারে সবাই মিলে পেছনে লাগলে কি করে বাঁচি—

গোহালে গিয়ে দ্রব ঠাকরুণ মুংলি গোরুকে দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা করলেন। মুংলি না খেলে তাঁর খাওয়া হয় না, এই বনজঙ্গলে ঘেরা নির্জ্জন স্বামীর ভিটে আঁকড়ে পড়ে আছেন, সবাই ছেড়ে গিয়েচে তাঁকে, কতক স্বর্গে কতক বা বিদেশে। তাঁর দুই ছেলে, দুই মেয়ে, নাতি, নাৎনী—একঘর, বড় গেরস্ত, যদি সবাই থাকতো আজ বজায়।

কেউ নেই আজ। মুংলিকে নিয়ে তিনি একা পড়ে আছেন গোপীনাথপুরের ভিটেতে। তাই গোরুটাকে অত ভালবাসেন, মাঠে বেঁধে দিয়ে বার বার করে দেখে আসেন, নদীতে জল খাওয়াতে নিয়ে যান।

সকালে উঠে দ্রব ঠাকুরুণের মনে হ'ল খিদের চোটে তিনি দাঁড়াতে পারচেন না। বাড়ীর পেছনে জঙ্গলের মধ্যে একটা ডুমুর গাছ থেকে ডুমুর পেড়ে আনলেন, দুটো সজনে শাক পাড়লেন উঠোনের গাছ থেকে। ঘাটের পথে মুখুজ্যে গিন্নীর সঙ্গে দেখা। মুখুজ্যে গিন্নীর ছেলে ক'টি লেখাপড়া শেখে নি, গাঁজা খেয়ে বেড়ায়—দ্রব ঠাকরুণের ক'টি নাতি চাকুরে, এজন্যে দ্রব ঠাকরুণের প্রতি তাঁর অন্তরে অন্তরে হিংসে বেশ।

জিজ্ঞেস করলেন—জ্বর হয়েছিল না কি শুনলাম খুড়ীমার ?

—হ্যাঁ মা, আজ দুটো ভাত রাঁধবো। তাই সকাল সকাল ঘাটে যাচ্চি—

—আর মা, তোমার থাকতেও নেই—অমন সব নাতি নাৎনী থাকতেও তোমার এই দুর্দ্দশা—সবই কপাল।

অর্থাৎ, দুই চাকুরে নাতি আছে বলে তোমার গুমর করবার কিছু নেই। তুমি যে তিমিরে সেই তিমিরে।

নদীর ঘাটে যাবার পথে দুধারে শুধু বন আর বাগান। কোন বাগানে বেড়া দেওয়া নেই, ঘন আশসেওড়া ও বনচালতে গাছের ডালপালা স্নানার্থীদের গায়ে লাগে বলে দু'একজন শুচিবাইগ্রস্তা বিধবা পথের নিতান্ত পাশের ডালগুলো হাত দিয়ে ভেঙে ভেঙে রেখেচেন। দ্রব ঠাকরুণ বনের মধ্যে ঢুকে উঁকি মেরে কি দেখচেন, এমন সময় মুখুজ্যেদের সেজ বৌ পেছন থেকে বললে—কি দেখছেন, ও খুড়ীমা?

—এই খয়েরখাগী কাঁঠালগাছটাতে কাঁঠাল আছে কিনা এক আধটা মা—একটা গাছ কাঁঠাল, সব্বনেশেদের জন্যে যদি মা তার কিছু ঘরে উঠলো—নিজে থাকি অসুখে পড়ে—

—কে কাঁঠাল নিলে খুড়ীমা?

—কে নিয়েচে আমি কি চৌকি দিতে গিয়েচি বসে বসে? এই পাড়ার মধ্যেই চোরের ঝাড়—ছাখ তোর, না দেখ মোর। সব্বনেশে কলিকালে কি ধম্মোজ্ঞান আছে মা?

—চলুন খুড়ীমা ঘাটে যাই—

দ্রব ঠাকরুণ বকতে বকতে ঘাটের দিকে চলেন। স্নান সেরে এসে দুটো আলো চাল ফুটিয়ে ডুমুরের চচ্চড়ি করে ভাত বেড়ে নিয়ে খেতে বসেচেন এমন সময় দেখলেন বাড়ীর পেছনে কাগজী লেবু গাছটার তলায় কি খস্ খস্ শব্দ হচ্চে।

দ্রব ঠাকরুণ হাঁক দিলেন—কে রে নেবুতলায়?

ক্ষীণ বালিকাকণ্ঠে উত্তর এল—এই আমি কনক, ঠাকুমা—

—কেন ওখানে কি শুনি? কি হচ্চে ওখানে? বের হয়ে আয় ইদিকে, সামনে আয়।

একটি ম্যালেরিয়াজীর্ণ দশ এগারো বছরের বালিকামূর্ত্তি অকুণ্ঠপদবিক্ষেপে লেবু ঝোপের আড়াল থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে উঠোনে এসে দ্রব ঠাকরুণের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়ালো।

—এই আমার মার মুখে অরুচি—কিছু খেতে পারে না, তাই গিয়ে বল্লে—যা তোর ঠাকুরমার নেবুগাছ থেকে একটা নেবু—

দ্রব ঠাকরুণ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললেন—হ্যাঁ যা—তোর বাবা নেবু গাছ পুঁতে রেখে গিয়েচে, যা তুলে নিয়ে আয় গিয়ে! যত সব চোর ছ্যাঁচড় নিয়ে হয়েচে—তোর মার অরুচি, তা হাটে নেবু কিনতে পারিস নে? এখানে কি? তোর বাবার গাছ আছে—এখানে?

বালিকা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

দ্রব ঠাকরুণ আপন মনে বকে যেতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরে বালিকা ভয়ে ভয়ে বল্লে—ও ঠাকুরমা—

—কি রে? কি?

—আমি চলে যাব?

—কেন, তোকে কি বেঁধে রেখেচি নাকি? যা—

—নেবু দেবেন না?

দ্রব ঠাকরুণ চুপ করে আপনমনে বড় বড় কয়েকটি ভাতের গ্রাস মুখে পুরে দিলেন, বাঁ হাতে ঘটি নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে খানিকটা জল খেয়ে অপেক্ষাকৃত নরমসুরে জিজ্ঞেস করলেন—

তোর পরনের কাপড় কাচা? ঐ কলসীটা থেকে আমায় একটু খাবার জল গড়িয়ে দে দেখি—

মেয়েটি তাই করলে। ধ্রুব ঠাকরুণ বল্লেন—অরুচি কেন? তোর মার কি ছেলেপিলে হবে না কি?

—তা তো জানিনে ঠাকুমা।

—যা, নিয়ে যা—তবে একটার বেশি নিবি নে—বুঝলি?

ধ্রুব ঠাকরুণ খেয়ে উঠে মাদুর পেতে একটু শুয়েছেন; এমন সময় মুখুজ্জে বাড়ীর বড় ছেলে অতুল এসে বল্লে—ও ঠাকুমা, শুয়েছেন নাকি?

—হ্যাঁ, কে? অতুল? কি ভাই?

—আপনার পিটুলি গাছ আছে? কলকাতা থেকে দেশলাইয়ের কারখানার লোক এসেচে গাঁয়ের পিটুলি আর শিমুল গাছ কিনতে। আপনার যদি থাকে—বেশ দর দিচ্চে—

—না বাপু, আমার নেই।

—কেন আপনার বাড়ীর পেছনে হরি রায়ের দরুণ জঙ্গলে তো বেশ বড় বড় পিটুলি গাছ আছে—

—না, আমি বেচবো না।

আসলে ধ্রুব ঠাকরুণের গাছপালার ওপর বড় মায়া, স্বামীর আমলের যা কিছু বৎসামান্য জমিজমা, তা প্রায়ই জঙ্গলাবৃত এবং বড় বড় বাজে গাছে ভর্তি। জ্বালানি কাঠ হিসেবে বিক্রী করলেও এ কয়লার দুর্মূল্যতার দিনে দু'পয়সা পাওয়া যায়, কিন্তু গাছের একটা ডাল কাটতেও তাঁর মায়া। না খেয়ে কষ্ট পাবেন, তবুও গাছ বিক্রীর কথা তুলতেও দেবেন না। একজনের শুঁয়োপোকা লাগাতে সে ডুমুরপাতা পাড়তে এসেছিল, কারণ ডুমুর পাতা দিয়ে শুঁয়ো-লাগা জায়গাটা ঘষলে শুঁয়ো ঝরে যায়, কিন্তু ধ্রুব ঠাকরুণ তাকে ডুমুর পাতা পাড়তে দেন নি। হয়তো এটা অতিরঞ্জিত গল্প মাত্র, তবে এর দ্বারা তাঁর মনের অবস্থা অনেকটা বোঝা যাবে।

বৈকালের দিকে ধ্রুব ঠাকরুণ বেশ ভালোই বোধ করলেন। পাড়ার এক প্রান্তে জঙ্গলে ঘেরা বাড়ী, বড় কেউ এদিকে বেড়াতে আসে না, এক ন'ঠাকরুণ ছাড়া কেউ উঁকি মেরে বড় একটা দেখে না, ধ্রুব ঠাকরুণ কিন্তু লোকজন, আড্ডা, মজলিস প্রভৃতি ভালোই বাসেন। কেউ এসে গল্প করে, এটা তাঁর খুবই ইচ্ছে—কিন্তু ও বেলায় সেই বালিকাটি ছাড়া বিকেলে আর কেউ এল না। সেও এসেচে নিজের স্বার্থে।

—ঠাকুর-মা, একটা লেবু দেবেন?

—কেন রে, কেন? ওবেলা তো—

—ওবেলার লেবু ওবেলা ফুরিয়েচে, এবেলা একটা দরকার—মা বল্লে—

—আচ্ছা, আয় উঠে বোস একটু—

বালিকাটি অনিচ্ছাসত্ত্বেও এসে বসে। নয়তো লেবু পাওয়া যায় না। বুড়ীর কাছে

বলতে তার ইচ্ছে হয় না, তার সমবয়সী বালিকারা রায়পাড়ার পুকুরধারে এতক্ষণ ধুলো তোলাতুলি খেলা আরম্ভ করে দিয়েচে···তার প্রাণ রয়েচে সেখানে পড়ে। কিন্তু ধ্রুব ঠাকরুণের নিঃসঙ্গ মন যাকে হয় আঁকড়ে ধরতে চায় এই নির্জ্জন বৈকাল বেলাটিতে—তবুও দুটো কথা বলবার লোক তো বটে।

ধ্রুব ঠাকরুণ আপন মনেই বকে চলেছেন, নাৎবৌয়ের মন্দ ব্যবহারের কথা, নাতির ছেলে খোকনের অলৌকিক গুণাবলী, ছোট নাতি পরেশ তাঁকে কি রকম ভালোবাসে···এই ধরণের নানা কথা শুনতে শুনতে ক্ষুদ্র শ্রোতাটির হাই ওঠে, সে করুণ স্বরে বলে—ঠাকুমা, মা সাবু চড়িয়ে আমায় বল্লে, নেবু নিয়ে আয়, বেলা গেল—

—হ্যাঁ হচ্চে হচ্চে—তারপর শোন না···

—মা বকবে—নেবু নইলে সাবু খেতে পারবে না—

—আচ্ছা, শোন্—তারপর খোকনমণি সেই পেয়ারা তো খাবেই, কিছুতেই ছাড়ে না—ওর মাও দেবে না—বড্ড হেজলদাগড়া মেয়ে ওর মা, আমি বলি, বৌ—চাচ্চে খেতে, এক টুকরো ওকে ছাও—তা আমায় বললে—আপনি চুপ করে থাকুন, আপনি কি বোঝেন ছেলেমেয়ে মানুষ করায়—একালের মাও অন্য রকম, আপনাদের সেকাল গিয়েচে।···আমি জানিনে ছেলেমেয়ে মানুষ করতে—তবে তুই তোর বর পেলি কোথা থেকে রে আবাগের বেটি?

—আমি এবার যাই ঠাকুমা—নেবু একটা—

—আচ্ছা তা যা নিয়ে একটা নেবু—শুনলি তো সব কাণ্ডখানা? দিদিশাশুড়ী বড় মন্দ—

এমন সময়ে বাড়ীর বাইরে একখানা গোরুর গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। খুকী কৌতূহলে চোখ বড় বড় করে বল্লে—ও ঠাকুমা, কে যেন এল গাড়ী করে—তোমার ওই ডুঁত-তলায় গাড়ী দাঁড়ালো—

বলতে বলতে ধ্রুব ঠাকরুণের মেজ নাতি নীরদচন্দ্র দুটি ভারী মোট দু'হাতে ঝুলিয়ে বাড়ী ঢুকে ডাক দিলে—ও ঠাকুমা—

ধ্রুব ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে একগাল হেসে বল্লেন—কাদু? আয়, আয় ভাই—ভালো আছিস?

কাদু এসে মোট নামিয়ে পিতামহীকে প্রণাম করলে, বালিকাটির দিকে চেয়ে বল্লে—এ হরিকাকার মেয়ে কনক না? ওঃ কত বড় হয়ে গিয়েচে—ভালো আছিস কনকী? নে দাঁড়া—একখানা গজা নিয়ে যা—

পুঁটুলি খুলে মেয়েটির হাতে একখানা বড় গজা দিতে সে নিঃশব্দে হাসিমুখে হাত পেতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, বড় মোটটার মধ্যে আরও কি কি জিনিস আছে দেখবার আগ্রহে। তাদের বাড়ীতে এমন কেউ নেই যে বিদেশে চাকুরি করে···নিতান্তই অল্পবিত্ত গৃহস্থের সংসার—চাকুরে বাবুরা বাড়ী আসবার সময় কি কি অপূর্ব্ব জিনিস না জানি নিয়ে আসে।

ধ্রুব ঠাকরুণ জিজ্ঞেস করলেন—তারপর, কি মনে করে? হঠাৎ যে। বুড়ীকে মনে পড়েচে তা হোলে? বাবাঃ, সারা আষাঢ় মাস অসুখে ভুগে ভুগে—তাই এখনও কি সেরেচি। এমন একটা লোক নেই যে, এক ঘটি জল এগিয়ে দ্যায়—ওই ন'বৌ ছিল তাই—এত চিঠি দিলাম, না এল টেবু, না এল বিন্দে, না এলে তুমি—

সন্ধ্যার পর ন'ঠাকুরুণ খবর পেয়ে ছুটে এলেন। গ্রামের ছেলে, জন্মাতে দেখেচেন, অনেক দিন পরে দেখে খুব খুশি। কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞেস করার পর বল্লেন—হ্যাঁ কানু, তা তোমরা সোনার চাঁদ সব নাতি থাকতে বুড়ী এখানে বেঘোরে মারা যাবে! পালাজ্বরে ধরেচে—এই আজ ভালো আছে, কাল এমন সময় লেপ কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়বে। কে ভাখে, কে শোনে—তার ওপর আবার গোরু—একটা বিহিত করে যাও যা হয়—নইলে—

কানু বল্লে—সে সব জন্যেই তো আসা। চিঠি পেয়েচি অনেক দিন, সায়েব ছুটি দিতে চায় না—পরের চাকরি—তাই দেরি হোল।

ধ্রুব ঠাকরুণ বল্লেন—ভালো কথা, ও ন'বৌ, দুখানা গজা নিয়ে যাও, জল খেয়ো—কানু এনেচে আমার জন্যে—তা ও যেমন পাগল, আমার কি দাঁত আছে যে গজা খাবো? নিয়ে যাও ন'বৌ।

—তা ভাও দুখানা, নিয়ে যাই। ভালোটা মন্দটা এ পাড়াগাঁয়ে তো চক্ষেই দেখতে পাইনে দিদি—বেঁচে থাক্ তোমার সোনার চাঁদ নাতিরা, তোমার ভাবনাটা কিসের? বিশেষ করে কানুর মত ছেলে নেই এ গাঁয়ে—আমি যা' বলবো তা মুখের ওপরেই বলবো বাপু—

ফলে ন'বৌ দু'খানার জায়গায় চারখানা গজা হাতে খুশি মনে বাড়ীর দিকে চল্লেন আর কিছুক্ষণ পরে।

নাতি-ঠাকুরমার পরামর্শ হ'ল রাত্রে। কানু এক মতলব কেঁদে এসেচে। ঠাকুরমাকে সে কাশী নিয়ে গিয়ে রেখে আসবে। তার একজন কে বন্ধুর মা কাশীতে থাকেন, সেই একই বাড়ীতে ঠাকুরমাকে রাখবে। পরদিন সকালে ন'বৌ শুনে খুব খুশি, অমন সব নাতি থাকতে ভাবনা কি? তীর্থধর্ম্ম করার সময়ই তো এই। তাঁর যদি আজ ছেলেটাও বেঁচে থাকতো।

আজ প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে সাত মাস মাত্র বয়সে ন'ঠাকরুণের ছেলে মারা গিয়েচে—সে-ই প্রথম, সেই শেষ। তাঁর আর ছেলেপুলে হয় নি।

যাবার দিন ধ্রুব ঠাকরুণ প্রিয় মুংলি গোরুটার ভার দিয়ে গেলেন ন'বৌকে। বার বার মাথার দিব্য দিলেন, মুংলিকে যেন যত্ন করা হয়। বল্লেন—ও গোরু তোমারই হয়ে গেল ন'বৌ, আমায় আশীর্ব্বাদ করো যেন কাশীতে হাড় ক'খানা রাখতে পারি—নাতিদের ঘাড়ের বোঝা যেন নেমে যাই—আমার বড় নাতির ভাবনা কি, তার সচ্ছল অবস্থা, লুচি পরোটা জলখাবার, তেল ঘিয়ে কলকলে করে পাঁচ ব্যাঞ্জন রান্না—আমি বুড়ী হয়েচি, ওদের সংসারে সেকেলে মতের লোকের জায়গা আর হয় না এখন—

ঘরের আড়ায় শুকনো নারকোল পাতার আঁটি, পাকাটির বোঝা যোগাড় করা ছিল,

বর্ষায় উনুন ধরানোর কষ্ট বলে সুগৃহিণী ধ্রুব ঠাকুরুণ যে-সময়ের-যা' সঞ্চয় করে রাখতেন। কাশীবাস করতে যাচ্ছেন, পেছনটান থাকলে তীর্থবাস হয় না—সে সব দান করে গেলেন কতক ন'ঠাকরুণকে, কতক এ'কে ওকে।

কনক একটা পাকা শসা হাতে এসে বল্লে—শসা খাবে ঠাকুমা?

—তুই এক বোঝা পাকাটি নিয়ে যা কনকী—ঠাকুমাকে মনে রাখবি তো? হ্যাঁ-রে?

কনক অনেকখানি ঘাড় নেড়ে বল্লে—হুঁ-উঁ-উ—

ন'ঠাকরুণ চোখের জল ফেললেন যাবার সময়ে।

ধ্রুব ঠাকরুণ ট্রেনে কোনো রকমে শুচিতা বজায় রেখে কাশী এসে পৌছলেন। একটা গলির মধ্যে দোতলা একটা বাড়ীর নীচের তলার ঘরে কানুর সেই বন্ধুর মা কাশীবাস করচেন। পাশেই আর একখানা ছোট ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছে ধ্রুব ঠাকরুণের জন্যে। অপর বৃদ্ধাটির কাছে চাবি ছিল ঘরের, তিনি চাবি খুলে দিলেন। ধ্রুব ঠাকরুণ নিজের জিনিসপত্র নিয়ে সেই ঘরে অধিষ্ঠান হোলেন।

ধ্রুব ঠাকরুণ ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সভয়ে আবিষ্কার করলেন, তাঁর প্রতিবেশিনী নদে' জেলার লোক। কথাবার্ত্তার ধরণ ও সুর শহুরে ও সম্পূর্ণ মার্জ্জিত। যশোর জেলার মানুষ ধ্রুব ঠাকরুণের ভয় পাবারই কথা বটে। তিনি এসে ধ্রুব ঠাকরুণের ঘরে ঢুকে বল্লেন—আপনার রান্নাবান্নার ব্যবস্থা কাল থেকে করলেই হবে—আজ আমার ঘরে দুধ আর মিষ্টি আছে, আপনার জন্যে রাখলুম কিনা।

ধ্রুব ঠাকরুণ ভয়ে ভয়ে বল্লেন—ও!

প্রতিবেশিনী নিজের ঘর থেকে খাবার এনে বল্লেন—আপনার লোমবস্ত্র বার করুন—

ধ্রুব ঠাকরুণ ভালো বুঝতে না পেরে বল্লেন—কি বল্লেন?

ধ্রুব ঠাকরুণের 'বল্লেন' এই কথায় 'ব'-এর উচ্চারণ যশোর জেলার উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী প্রসারিত উচ্চারণ, প্রতিবেশিনী বৃদ্ধার উচ্চারণে এইসব স্থানের উচ্চারণ যতদূর সম্ভব আকুঞ্চিত। 'বল্লেন'-এর উচ্চারণ 'বোল্লেন'—'ও' কার-এর উচ্চারণও যতদূর সম্ভব ঘোরালো।

—বোলচি, লোমবস্ত্র বের করে পরুন, একটু কিছু মুখে দিতে হবে তো?

লোমবস্ত্র কি জিনিস, পাড়াগাঁয়ের মানুষ ধ্রুব ঠাকরুণ কখনো শোনেন নি—তবে জিনিসটা যে বস্ত্রজাতীয় দ্রব্য তা বুঝতে পারলেন, বল্লেন—সে তো আমার নেই!

—লোমবস্ত্র নেই? আপনি জপ করেন কি পোরে?

—এই সাদা থান প'রেই জপ করি, আর কোথায় কি পাবো?

বাড়ীখানা গলির মুখে হ'লেও প্রায় সদর রাস্তার ওপরে। অনেক রাত পর্য্যন্ত গাড়ী-ঘোড়া রাস্তার গোলমাল থামে না। নিরিবিলি বনজঙ্গলের মধ্যে বাড়ীতে একা থাকা ধ্রুব ঠাকরুণের চিরদিনের অভ্যাস, এত গোলমালে বড়ই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন তিনি। উঃ, কি মুস্কিলেই পড়া গেল! নাঃ কাশীর লোক ঘুমোয় কখন?

কানু তার পরদিন বন্ধুর হাতে পল্লীবাসিনী পিতামহীকে সমর্পণ করে কর্ম্মস্থানে চলে গেল, তার ছুটি ফুরিয়েচে। বন্ধুর মার নাম নীরজবাসিনী, ধ্রুব ঠাকরুণের চেয়ে তাঁর বয়স দু'পাঁচ বছর কম হবে, মাথার সব চুল এখনও পাকে নি—তবে সেটা স্বাস্থ্যের গুণেও হতে পারে।

ধ্রুব ঠাকরুণ এঁর সঙ্গে দশাশ্বমেধ ঘাটে বিকেলে বেড়াতে গেলেন—খুব লোকজনের ভিড়, গান, বক্তৃতা, কথকতা। এক গেরুয়া কাপড় পরা সন্নিসির চারিপাশে খুব ভিড়, নীরজা সেখানে জুটলেন গিয়ে। কর্ম্মবাদ, সেবাধর্ম্ম ইত্যাদি নিয়ে সন্নিসি কি সব কথা বলে যাচ্ছেন, ধ্রুব ঠাকরুণ অতশত বুঝতে পারলেন না। ফিরবার পথে ধ্রুব ঠাকরুণ জিজ্ঞেস করলেন—উনি কেডা?

—উনি রামকৃষ্ণ মঠের একজন বড় ইয়ে—স্বামী সেবানন্দ।

—কি মঠ?

—কেন রামকৃষ্ণ মঠের কথা শোনেন নি; ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের—মস্ত বড় কাণ্ড ওঁদের—

—রাম আর কৃষ্ণ দুই ঠাকুরের নাম বুঝি?

নীরজা বিস্ময়ে ধ্রুব ঠাকরুণের দিকে চেয়ে বল্লেন—আপনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম শোনেন নি?

—না। কে তিনি—কই না—এখানে আছেন?

নীরজা আর কোন কথা বল্লেন না। এমন বর্ব্বরের সঙ্গেও তিনি বেড়াতে বেরিয়েছেন যে রামকৃষ্ণদেবের নাম পর্য্যন্ত জানে না! ধ্রুব ঠাকরুণের কোনো দোষ নেই, তিনি অজ্ঞ সেকেলে লোক, অজ পল্লীগ্রাম ছেড়ে জীবনে কখনো কোথাও যাননি। গোপীনাথপুরের জঙ্গলে ও-নাম কখনো কারো মুখে শোনেনও নি। তিনি জানেন, রাম, কৃষ্ণ, রাধা, দুর্গা, লোচনপুরের জাগ্রত কালী, কালীঘাটের কালী ইত্যাদি। অতবড় নামের কোনো ঠাকুরের কথা কই—কেউ তো তাঁকে বলে নি।

ধ্রুব ঠাকরুণ ভয়ে ভয়ে থাকেন। তাঁর সঙ্গিনী তাঁকে নিতান্ত নাস্তিক, অজ্ঞ, মূর্খ বলে না ঠাওরান।

দিন কয়েক যেতে না যেতেই ধ্রুব ঠাকরুন বুঝে নিলেন সঙ্গিনীটি ধর্ম্মবাতিকগ্রস্তা। সাধু সন্নিসির ভক্ত। যদি কোথাও কোনো নতুন ধরণের সাধু মন্দিরে কি ঘাটে বসে আছে, তবে আর নিস্তার নেই। সেখানে বসে অমনি গরুড়ের মত হাত জোড় করে বক্ বক্ বকুনি জুড়ে দেবে। আর কি-সব কথা জিজ্ঞেস করবে, কর্ম্মফল কি, পুনর্জ্জন্ম কি, হেনো তেনো। রাস্তা-ঘাটে বেরুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, বাসায় ফেরবার নামটি নেই। এত বিরক্ত ধরে ধ্রুব ঠাকরুণের—কিন্তু তিনি কি করবেন? কাশীর রাস্তা চেনেন না—একাও বাসায় ফিরতে পারেন না সঙ্গিনী না ফিরলে।

একদিন বিশ্বনাথের মন্দিরে সন্ধ্যার আরতি দেখতে গেলেন দুজনেই।

সেখানে এক সন্ন্যাসিনী নাটমন্দিরে বসে আছেন, গেরুয়া কাপড় পরনে, মাথায় জটা, অনেক মেয়েছেলের ভিড় হয়েচে সেখানে। নীরজা তো সাধু সন্ন্যাসী দেখলে সর্ব্বদা একপায়ে খাড়া, চারিপাশের ভক্তের দলে গেল মিশে তাঁকে নিয়ে। দ্রব ঠাকরুণ শুনতে লাগলেন কেউ জিজ্ঞেস করচে, মাইজি, ঠাকুরের দেখা পাওয়া যায়?

কেউ বলচে—মাইজি, আমার মেয়ের মাদুলি দেবেন তো আজ?

—আজ আমার হাতখানা দয়া করে দেখবেন কি?

নীরজা জিজ্ঞেস করলেন—মাইজি, আমার ভক্তি হচ্চে না কেন?

দ্রব ঠাকরুণ শুনে মনে মনে হেসে আর বাঁচেন না। সর্ব্বদা সাধুসন্নিসি নিয়েই আছো, এখানে প্রণাম, ওখানে ধন্না, দুঘণ্টা ধরে নাক টেপা—এতেও যদি তোমার ভক্তি না হয়ে থাকে, গঙ্গার জলে ডুবে মরো গিয়ে—ঢং দেখে আর বাঁচি নে! মরণ আর কি!

তারপর সবাই চলে গেল—নীরজা সেই যে সেখানে চোখ বুজে ধ্যান না কি যোগে বসলো আর ওঠে না। দ্রব ঠাকরুণও কিছু বলতে সাহস পান না। এদিকে তাঁর মনে পড়লো সুজি একদম নেই, সেকথা এতক্ষণ মনে ছিল না, এত রাত হয়ে গেল কোথায় বা সুজি কেনা হবে। রাত্রে একটু মোহনভোগ খাওয়া, তাও আজ ধর্ম্মের ভিড়ে বুঝি বা হয় না।

বসে বসে দ্রব ঠাকরুণ বিরক্ত হয়ে উঠলেন। মন্দির থেকে বাঙালী মেয়েরা প্রায় সব চলে গিয়েচে, এদেশী লোক যারা হিন্দি মিন্দি বলে, তাদের দলই যাচ্চে আসচে! কি জানি ওদের কথা তিনি কিছুই বুঝতেও পারেন না, বলতেও পারেন না।

আজ মাস তিনেক গ্রাম থেকে এসেচেন। বেশ শীত পড়ে গিয়েচে কাশীতে। মুংলি গোরুটার কথা এত করেও আজকাল মনে পড়চে! শীতের রাত্রে পাছে মুংলির কষ্ট হয় বলে তিনি গোয়ালে আগুন করে রাখতেন। তাঁর গাছটাতে খুব ডুমুর হয়েচে নিশ্চয়, কে জানে একটা গাছ ডুমুর কারা খাচ্চে? কম ডুমুর হয় গাছটাতে! আহা, ন'বৌ কি মুংলিকে অত যত্ন করচে?—তাঁর মত? তিনি যে পেটের মেয়ের মত ওকে···না, তাঁর চোখে জল এসে পড়ে।

আজই এতকাল পড়ে ন' বৌয়ের পত্র এসেচে দেশ থেকে। তাই বেশি করে মনে পড়চে দেশের কথা। ন'বৌ লিখেচে মুংলি ভালো আছে, শীগগির বাছুর হবে। তাঁর বাড়ীর দাওয়ার খুটি না বদলালে নয়। কাহু বা বিন্দেকে যেন চিঠি লেখা হয় সেজন্যে।

নীরজা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধ্যান ভঙ্গ করে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন—দিদি, চলো যাই···সত্যি কি পবিত্র স্থান, না? ইচ্ছে হয় মা যে আবার সংসারে ফিরে যাই, রাঁধি খাই।

দ্রব ঠাকরুণ মনে মনে বল্লেন—মরো-না এখানে শুকিয়ে হত্যে দিয়ে—কে মাথার দিব্যি দিয়েছে রাঁধতে খেতে!

নীরজা বল্লেন—করঞ্জাসটা অভ্যেস করচি কি না, প্রায় হয়ে এল—

দ্রবময়ী নীরব। মাগীটা পাগল নাকি? কি সব বলে বোঝাও যায় না। রাত দুপুর

বাজলো, বাবা, এখন বাসায় চল্ দিকি !

বাসায় এসেও কি তাই নিস্তার আছে ?

নীরজা ডাকবেন তাঁর ঘর থেকে—ও দিদি, একটু গীতাপাঠ করি শোনো—

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে তাঁকে যেতে হয়। গীতা-টিতা ওসব তিনি বোঝেন না। সুবচনীর ব্রতকথা, সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শিবরাত্রির ব্রতকথা এসব শোনা তাঁর অভ্যাস আছে, বেশ দিব্যি বুঝতেও পারেন—এসব শক্ত শক্ত কথার কি কাণ্ডমাণ্ড, এক বর্ণও যদি তিনি বোঝেন। আর মাগীর চোখ উল্টে, কান্না কান্না মুখের ভাব করে পড়বার ভঙ্গিই বা কি ! দ্রব ঠাকরুণ না পারেন হাসতে, না পারেন হাসি চাপতে ! এমন বিপদেও মানুষ পড়ে গা !

নীরজা পড়তে পড়তে বলবেন—আহা-হা ! কি চমৎকার।

দ্রব ঠাকরুণ বসে ঢুলতে ঢুলতে ভাববেন—থামলে যে বাঁচি—

সকালে উঠে নীরজা বল্লেন—আজ আমার গুরুদেব আসবেন, দিদি দু'খানা লুচি ভেজে দিও তো আমার ঘরে বসে।

বেলা দুটোর সময় এক সন্নিসি এসে হাজির। বেশ মোটা ভুঁড়িওয়ালা, এই লম্বা দাড়ি। নীরজা সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে দু'বার মাথা ঠুকলেন গুরুদেবের পাদপদ্মে। আহারাদির যোগাড় করতেই কাটলো সারাদিন—তিনসের দুধ মেরে একসের হ'ল, ঘরে রাবড়ি মালাই তৈরি হ'ল। লুচি ভাজা হ'ল। সন্ধ্যার সময় নীরজা বসলেন গুরুর কাছে কি সব ক্রিয়া শিখতে। আসন না মাথামুণ্ডু তাই শিখতে। যত বা এ বকে, তত বা ও বকে। মনে হ'ল বুঝি কানের পোকা সব বেরিয়ে যায়।

গুরুদেব বাঙালী। রাত ন'টার পরে দ্রব ঠাকরুণকে ডাক দিলেন।

বল্লেন—তোমার বাড়ী কোথায় ?

—গোপীনাথপুর, যশোর জেলা—

—কে আছে বাড়ীতে ?

—নাতিরা আছে, তাদের ছেলে বৌ আছে।

—তুমি কাশীবাস করতে এসেচ ?

—হ্যাঁ।

—নাম কি ?

দ্রবময়ী দেব্যা—

—দীক্ষা হয়েচে ?

—না।

নীরজা চোখ কপালে তুলে বল্লেন—কি সর্ব্বনাশ ! দীক্ষা হয়নি এতদিন ? তা তো জানতাম না ?

গুরুদেব বল্লেন—দীক্ষা নিতে হবে মা তোমাকে।

—আমার পয়সা নেই, দীক্ষা নিতে গেলে খরচ আছে। নাতিরা এগারো টাকা করে

মাসে পাঠায়—তার মধ্যে ঘর ভাড়া, তার মধ্যে খাওয়া। পয়সা পাই কোথায় ?

—দীক্ষা না নিলে কাশীবাসে ফল কি মা ?

—ফলের জন্তে তো আসিনি, শরীরটা সারাতি এসেছিলাম।

নীরজা রাগের সুরে বল্লেন—শরীর আগে না পরকাল আগে ?

ধ্রুব ঠাকরুণ চুপ করে রইলেন।

গুরুদেব বল্লেন—নীরজা-মার কথার উত্তর দাও—চুপ করে থাকলে হবে না।

নীরজা বল্লেন—গীতায় ভক্তিযোগ সেদিন পড়ছিলাম, শুনলে তো দিদি ? কর্ম্মের চেয়েও ভক্তি বড়, স্বয়ং ভগবান বলচেন—

আঃ কি বিপদ ! মাগীর সব সময়েই কি আবোল-তাবোল বকুনি ?

মুখে বল্লেন—আমি তো কিছু বুঝি নে, আপনারা যা বলেন। তবে এবার কিছু হবে না। নাতি সাতটাকা পাঠিয়েছিল, তা ঘর ভাড়াতেই গিয়েচে। হাতে টাকা না থাকলি—

তবুও দু'জনই নাছোড়বান্দা। দীক্ষা নিতেই হবে।

গুরুদেব বল্লেন—কাশীবাস করচো মা, তোমার যথেষ্ট বয়েস হয়েচে। গুরুদীক্ষা না নিলে যে সবই মাটি। আজ আছ, কাল নেই। পৃথিবী কিছুই না—ইহকাল কিছুই না—

নীরজা বল্লেন—গুরুর মুখেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ইহকালেও তিনি, পরকালেও তিনি—

ধ্রুব ঠাকরুণ মনে মনে বল্লেন—আ মরণ মাগীর ! তবে সোয়ামী কোথায় যাবে মেয়েদের ! ঢং ছাখো না—! যাই হ'ক, বহু তর্ক করেও ঠাকরুণকে ধ্রুব করা গেল না। নাম ধ্রুবময়ী হ'লে কি হবে, ভেতরে বেজায় শক্ত। নীরজা অবিশ্যি তাঁর জ্ঞান বুদ্ধি মতে একজন সত্তর বছরের মৃত্যুপথযাত্রিণীর ভালো করবারই যথেষ্ট চেষ্টা করছিলেন, সে রাজী না হ'লে তিনি আর কি করবেন ?

নীরজার ভক্তি—হ্যাঁ, সে দেখবার মত একটা জিনিস বটে। গুরুর পাদোদক পান না করে তিনি দাঁতে তৃণ কাটবেন না। গুরুর বাক্য বেদবাক্যের চেয়েও মূল্যবান তাঁর কাছে। পুরোনো একছড়া সোনার হার ছিল, সেটা বিক্রি করে এসে টাকা তুলে দিলেন গুরুদেবের হাতে।

কথাটা শুনে ধ্রুব ঠাকরুণ জিজ্ঞেস করলেন—অতগুলো টাকা দিয়ে দিলে গুরুদেবকে ?

—টাকা সার্থক হ'ল, দিদি—

—তোমার নিজের হার ?

—ও আমার বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ী থেকে দিয়েছিল—তিনি হাতে করে দিয়েছিলেন—

—সেই হার তুমি দিয়ে দিলে বেচে ?

—দিদি, সংসার অনিত্য, সবই অনিত্য। কে কার স্বামী, কে কার স্ত্রী ? সবই ভগবানের মায়া। মায়ায় সব ভুলে থাকা—গুরুই কেবল নিত্য বস্তু—

—তা তো বটে।

এ মাসীর মুখে সব সময় বড় বড় কথা। দিগে যা তোর সব কিছু গুরুর পাদপদ্মে বিলিয়ে, —তাঁর কি? বিয়ের পরে স্বামী নিজের হাতে যে হারছড়া দিয়েছিল, তা কোনো মেয়ে-মানুষ এভাবে ঘুচিয়ে দিতে পারে? গভীর রাত পর্য্যন্ত শুধু এই কথাটিই বার বার তাঁর মনে পড়ে। সে সব দিন ঝাপসা হয়ে গিয়েচে, মনের আকাশ বিস্মৃতির মেঘে ঢাকা। ওই গোপীনাথপুরের ভিটে অমন ছিল কি তখন? ফুলশয্যার রাত।

হঠাৎ মনে পড়ে যায়, গত আষাঢ় মাসের প্রথমে উত্তর দিকের ভাঙা পাঁচিলের গায়ে এতটুকু একটা শসাগাছ নতুন বর্ষার জল পেয়ে গজিয়েচে দেখে তিনি শুকনো কঞ্চি কুড়িয়ে একটা মাচা বেঁধে দিয়েছিলেন—এতদিনে গাছ বড় হয়েচে, কত শসার জালি পড়েচে গাছটাতে। কে খাচ্চে সে বনের মধ্যে? হয়তো কনকী আসে লেবু তুলতে—এক গাছ লেবু রেখে এসেছিলেন। সে-ই হয়তো শসা পেড়ে নিয়ে যায়—কে জানে?

হঠাৎ কি একটা কুস্বপ্নে দ্রব ঠাকরুণ চমকে ওঠেন। নীরজার ঘর থেকে শব্দটা আসচে।

মাসী এত রাত্রে করে কি? হস্ হস্ করে অত জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলচে কেন? ঘুমের ঘোরে মুখ-চাপা লাগলো নাকি?

দ্রব ঠাকরুণ ডাকলেন—শুনচো—ওগো—কি হয়েচে? ওগো—

নীরজা বল্লেন—ডাকচেন কেন দিদি?

—বলি ও শব্দ কিসের?

—কুম্ভকের রেচক-পূরক অভ্যেস করচি—অনেক রাত ভিন্ন হয় না কিনা,—ঠাকুর তাই বলে গেলেন।

সে আবার কি রে বাবা! মাগী তো ঘুমুতেও জায় না রাত্তিরে?

দ্রব ঠাকরুণ বল্লেন—যাক গে—ঘুমের ঘোরে মুখ-চাপা হয় নি তো?

—না দিদি—ঘুমুইনি এখনও। ঘুমুলে যোগের ক্রিয়া হয় না। জীবনটা যদি ঘুমিয়েই কাটাবো, তবে পরকালের কাজ করবো কখন?

—তা বেশ, বেশ।

—দিদি—ঘুমুলেন?

—না, কেন?

—নির্ব্বিকল্প সমাধি না হওয়া পর্য্যন্ত আমার মনে শান্তি পাচ্চি নে, পাবোও না। দেহ কি জন্যে দিদি? ঘুমুবার জন্যে নয়। আরামের জন্যে নয়—শুধু নিজের কাজ করে যাওয়ার জন্যে। দিন কিনে নাও, শুধু দিন কিনে নাও—।

দ্রব ঠাকরুণের পিত্তি জলে গেল। কিনগে যা দিন মাগী, যদি তোর পয়সা থাকে! রাত্তিরে একটু ঘুমুতে দে অন্তত।

শীতকাল এসে গেল। কানু বড়দিনের ছুটিতে একবার কাশী এসে পিতামহীর সঙ্গে দেখা করে গেল।

দ্রব ঠাকরুণ তাকে বল্লেন—কানু ভাই, অন্য একটা বাসা পাওয়া যায় না ?

কানু বিস্মিত হয়ে বল্লে—কেন এখানে কি হ'ল ! সত্যর মা রয়েচেন, এই তো সব চেয়ে ভালো—

—ও মাগী পাগল।

—পাগল ! সে কি !

—না বাবু, বেজায় ধর্ম্মিষ্টি। অত ধর্ম্মিষ্টি আমার পোষাবে না। আমাকে তুই সরিয়ে নিয়ে যা—

কানু কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলে। ঠাকুরমার যেমন কাণ্ড।

বল্লে—আচ্ছা ঠাকুমা, শেষবয়েসে কাশীবাস করতে এলে—না হয় তুমিও হও একটু ধর্ম্মিষ্টি ! হ্যাঁ, উনি ওই রকমই বটে। সত্য বলছিল, মা কিছুতেই দেশে থাকতে চান না। এই গত বোশেখ মাসে সত্যর ছোট ভাইয়ের বিয়ে গেল, ওঁর ছোট ছেলের—ওঁকে কত চিঠিপত্তর, কত অনুরোধ—কিছুতেই গেলেন না। বল্লেন, যে মায়া একবার কাটিয়েচেন, তাতে আর জড়িয়ে পড়তে চান না। ছোট ছেলে টেলিগ্রাম পর্য্যন্ত করলে, কোনো ফল হ'ল না।

দ্রব ঠাকরুণ অবাক হয়ে বল্লেন—বলিস কি রে কানু, সত্যি ?

—মিথ্যে বলচি তোমার কাছে ঠাকুমা ?

—আমায় এখান থেকে তুই সরিয়ে দে ভাই।

—ছিঃ—আচ্ছা, তুমি অত নাস্তিক কেন ঠাকুমা ? ওঁর সঙ্গে থেকে একটু ধর্ম্ম শেখো না, চিরকালই বিষয় আর সংসার নিয়েই তো কাটালে।

—হাঁপ লেগে মরে যাবো যে এখানে থাকলে—

—আবার ওই সব নাস্তিকের মত কথাবার্ত্তা—ঠাকুমা তুমি কি ?

শীত কেটে গ্রীষ্ম এল, চলেও গেল। আবার আষাঢ় মাসের প্রথম। দেশের খবর নেই অনেকদিন। ন'ঠাকরুণের চিঠি আগে আগে আসতো—গত তিন চার মাস তাও বন্ধ কথায় কথায় একদিন নীরজাকে কথাটা বলেই ফেল্লেন।

—দেশে কে আছে আপনার ? শুনেচি সেখানে থাকে না কেউ ?

—বাড়ীটা, গাছটা পালাটা—

—দিদি, এখনও ঐ সবের মায়া ? বিশ্বনাথের পাদপদ্মে মন সমর্পণ করুন সব বন্ধন ঘুচে যাবে। কেউ কিছু নয়, কিছু নয়—একমাত্র তিনিই সত্যি। বলে নীরজা চোখ কপালে তুলে ওপরের দিকে চেয়ে রইলেন। দ্রব ঠাকরুণ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—ওই যাঃ, দাঁড়াও, কড়ায় দুধটুকু বুঝি বেড়ালে খেয়ে গেল ! নাঃ বেড়ালের জ্বালায়—যত বা বেড়াল, তত বা বাঁদর। অমন গামছাখানা সেদিন—

—দিদি, আজ আমার সঙ্গে চলুন, কেদার ঘাটে কাশীখণ্ডের ব্যাখ্যা করবেন উপীন কথক।

শোনবার জিনিস। কাশীতে এসে কাশীখণ্ড শুনতে হয়—

—আমার শরীর ভালো না, আজ থাক্, তুমি যাও—

নীরজা নাছোড়বান্দা, অবশেষে নিয়ে গেলেন দ্রব ঠাকরুণকে। কেদার ঘাটে এর আগেও দু'তিন বার দ্রব গিয়েচেন সত্যর মার সঙ্গেই। ওপরের রানার চওড়া চাতালের একপাশে ফর্সা রোগামত কথক ঠাকুর কথকতা সুরু করেচেন—তাঁকে ঘিরে বাঙালী মেয়ে-পুরুষের ভিড়। পুরুষের চেয়ে মেয়ে অনেক বেশি।

সত্যর মা জিজ্ঞেস করলেন—দিদি, প্রণামী কিছু এনেচেন তো?

—তা তো বল্লে না—আনিনি—

—আট আনার কম দেওয়া যায় না। আচ্ছা, আপনারটা আমি দিয়ে দেব এখন—

—আমার আট আনা না দিয়ে চার আনা বরং ছাও। নাতিরা ক'টাকা বা পাঠায়?

—এখানে যা দেবেন দিদি, পরকালে তোলা রইল—

বর্ষার গঙ্গায় ঢল নেমেচে। কেদার ঘাটের সামনের নদীতে কাদের বড় একটা বজরা ভেসে চলেছে, দু'তিনখানা পাল্কিতে সুসজ্জিতা নরনারী নদীভ্রমণে বার হয়েচে। রামনগরের দিকে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে—উঁচু বাড়ীর ছাদের কার্নিসে তরল সোনার মত ঝিলমিল করচে রাঙা রোদ। কথক ঠাকুর সুকণ্ঠে গান ধরেচেন, কাশী সকল তীর্থের সার, মৃত্যুর সময় মণিকর্ণিকার ঘাটে স্বয়ং বিশ্বনাথ কানে মন্ত্র দেন—মানুষের শিবলোকপ্রাপ্তি ঘটে—এই হ'ল গানের অর্থ।

দ্রব ঠাকরুণের মন অজ্ঞাতে অনেকদূরে চলে গেল। তার শ্বশুরবাগী গাছে কত কাঁঠাল হয়েচে এই আষাঢ় মাসে, বড্ড কাঁঠাল ধরে গাছটাতে, শেকড়ে পর্য্যন্ত কাঁঠাল। তিনটে আম গাছে আমও নিশ্চয়ই খুব ধরেছিল—নাতিরা কি গিয়েচে আম খেতে? তাদের সেদিকে দৃষ্টি নেই। বারোভূতে লুটে খাচ্চে।

রাত্রি নামলো। নীরজা বল্লে—চলুন দিদি—

দ্রব ঠাকরুণ লক্ষ্য করেচেন সমস্ত সময় নীরজা মাগী কোঁস কোঁস করে কেঁদেচে। আর কেবল বলেচে—আহা-হা-হা!

যদি এ মাগীর সঙ্গ ছাড়তে পারতেন!—কিন্তু তা হবার নয়, কানু শুনবে না।

বাসায় এসে নীরজা দেখলেন তাঁর সঙ্গিনীর মন বড় খারাপ—অন্যমনস্ক ভাব, বিশেষ কোন কথা বলে না।

কাশীখণ্ড শুনে আজ তা হলে খুব ভালো লেগেচে বোধ হয়। পাষাণ বুঝি গলেচে।

নীরজা বল্লেন—কি ভাবচেন দিদি?

—একটা-গাছ কাঁঠাল দেশে। শ্বশুরবাগীর কাঁঠাল, সে তুমি কখনো খাওনি—খেলে বুঝতে।

—দিদি, এখনও আপনার মায়ার বন্ধন গেল না? আপনার তো দু'টো একটা গাঁ, আমার তিনটে বড় বাগান—কলমের বোম্বাই, মালদ' ফজলি—মায় ল্যাংড়া পর্য্যন্ত। আমি

তো ফিরেও চাইনি ওসব দিকে। ছেলেরা কাঁদে, বলে, এখন কি কাশীবাস করবার সময় হয়েচে তোমার? আমি বলি, না, সংসারের মায়ায় আর না। গানে বলে—কেবা কার পর, কে কার আপন; (এই মরেচে, মাগী আবার শুরু করেচে!) কালশয্যা পরে মোহতন্দ্রা ঘোরে, দেখে পরস্পরে অসার আশার স্বপন।

—তা আমি বলি—এতকাল তো সংসারের বন্ধনে ঘুরে আশার স্বপন অনেক দেখলুম। এইবার পরকালের কথা ভাবি। আর আমার এই যে গুরুদেব, উনি দেহধারী মুক্ত পুরুষ—ওঁর কৃপায়—(নীরজা উদ্দেশে প্রণাম করলেন।)

দ্রব ঠাকরুণ মুখে বল্লেন—তা তো বটেই—

—চলুন দিদি কাল বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে সেই মাইজির কাছে আপনাকে নিয়ে যাই—আপনার বয়স আমার চেয়ে বেশি, আপনার এখন উচিত গুরুমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে সব বন্ধন মুক্ত হয়ে একমনে কাশীবাস করা। আমাদের আর ক'দিন দিদি? শমন তো দোরে দাঁড়িয়ে—সব রকম তো দেখলুম শুনলুম।

দ্রব ঠাকরুণ মনে মনে বল্লেন—তোমার মুণ্ডু করলুম, মাগীর কথার আবার ধরণ শোনো-না, ভাটপাড়ার ভট্চাজ্জি এসেচেন! মুখে বল্লেন—মুংলি বলে একটা গাই গোরু ছিল আমার—বড্ড ন্যাওটো। যেখানে যাবো, সেখানে যাবে। আমার হাতে না খেলে তার পেট ভরতো না। এই বেশ কচি কচি বাঁশপাতা এনে মুখে দেতাম তুলি আর—

—আঃ, আবার ওই সব কথা আপনার মুখে! জড়ভরতের কথা জানেন তো? অত বড় জ্ঞানী—পূর্ব্ব জন্মের এক হরিণের মায়ায় তাঁর সব গেল। ভগবানের চিন্তা করুন—ভগবানের চিন্তা করুন—সব মিথ্যে। সব মিথ্যে।

দ্রব ঠাকরুণ কোন কথা বল্লেন না। তাঁর ওর কথা একেবারেই ভাল লাগে না। মাগী যেন কি! কি বলে, কি করে! মাগী এমন পাষাণ যে, ছোট ছেলের বিয়েতে বাড়ী গেল না। মুখ দেখতে আছে ওর? ছিঃ—

সারারাত্রি স্বপ্নের ঘোরে দেখলেন তাঁর গোপীনাথপুরের ভিটেতে চালাঘরের ছাঁচতলায় ম্লান মুখে ছলছল চোখে তাঁর মুংলি দাঁড়িয়ে রয়েচে—ন'বৌ তাকে যত্ন করচে না, বুড়ী হয়েচে মুংলি, তেমন দুধ ত আর দিতে পারে না—মুংলিকে তিনি তার মায়ের পেট থেকে টেনে বার করে এতকাল নিজের মেয়ের মত পুষেছিলেন—তিনি নেই, কে ওকে দেখে? কাঁঠাল হয়েচে বটে খয়েরখাগী গাছটাতে! এত কাঁঠাল তিন চার বছরের মধ্যে হয়নি। তিনি নাইতে যাচ্চেন নদীতে, মুখুজ্যে-গিন্নি বলচে—হ্যাঁ খুড়ী মা, এবার তোমার গাছে কী কাঁঠাল ধরেচে! তা আমায় একটা দিও, তোমার নাতিদের খেতে দেবো—

খড় উড়ে উড়ে পড়চে বাড়ীর চাল থেকে। কানু বা বিন্দে দেশে যায়নি, ঘরও সারায়নি। এবার বর্ষায় কি টিকবে চালে খুঁচি না দিলে?

কনক বলচে—অ ঠাকুমা, একটা নেবু দেবা? আমার মার অরুচি হয়েচে কিছু খেতি পারে না—

সকালে উঠে নীরজা নিজেই গঙ্গাস্নান করে এসে স্বপাক হবিষ্যান্ন চড়িয়েছেন এবং প্রতিদিনের অভ্যাসমত ইষ্টমন্ত্র জপ শেষ করে গাল-বাদ্য সহকারে শিবপূজা করছেন। দ্রব ঠাকরুণের একটু বেলা হয়েচে আজ উঠতে। মনও খুব ভার। তাঁর আপনার জন পড়ে রইল—তাঁর মুংলি, তাঁর খয়েরখাগী গাছটা, তাঁর ডুমুর গাছ—আর তিনি কোথায়! আর ও-ই মাগীর জ্বালায়···

নীরজার গাল-বাদ্য থামলো। দ্রব ঠাকরুণকে বল্লেন—আজ বড় সুখবর পেলুম দিদি—গঙ্গাস্নানে গিয়ে গুপ্তিপাড়ার সইয়ের সঙ্গে দেখা—সেও আমার মত কাশীবাস করচে—বাঙালীটোলায় থাকে, বল্লে, গুরুদেব আসচেন সামনের সোমবারে। হরিদ্বার থেকে ফেরবার পথে আমার এখানে পায়ের ধুলো দিয়ে তবে যাবেন! সইও একই গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েচে কিনা। আজ বড় শুভদিন আমার। গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করেই বেঁচে আছি, এবার এলে আপনাকে দীক্ষা নিতেই হবে দিদি, আমি ছাড়বো না। গুরুদীক্ষা না হ'লে দেহ পবিত্র হয় না, ভবসাগর পার হ'তে হ'লে গুরুর চরণরূপ ভেলা চাই আগে—নইলে হাবুডুবু খেয়ে মরতে হবে যে দিদি?

দ্রব ঠাকরুণ বল্লেন—তা তো ঠিক, তা তো ঠিক—

গুরুদেবের আগমনের পূর্ব্বেই শনিবার সকালের গাড়ীতে কানু এসে হাজির হ'ল। দ্রব ঠাকরুণ নাতির কাছে কেঁদে পড়লেন—তুই আমায় গুপ্তীনাথপুরে নিয়ে চল্ ভাই, আমার আর কাশীবাসে কাজ নেই—বাবা বিশ্বনাথ মাথায় থাকুন। ও মাগীর কাছে আর ৬'মাস থাকলে আমি পাগল হয়ে যাবো।

ফলে সোমবার কাশীতে গুরুদেবের শুভাগমনের দিন দুপুরের ট্রেনে দ্রব ঠাকরুণ দেশের হস্টাশনে তাঁর বোঁচকা-তোরঙ্গ নিয়ে নাতির সঙ্গে এসে নামলেন।

ন'ঠাকরুণ শুনে ছুটে এলেন—ও দিদি—দিদি—

—হ্যাঁ ন'বৌ—আমার মুংলি ভালো আছে?

—ভালো নেই দিদি! ওঠে না, খায় না—তোমার যাওয়ার পর থেকেই, গোয়ালে শুয়েই থাকে।

—সে আমার মন বলেচে ভাই, তুমি কি বলবে। তাকে রাত্তিরে স্বপ্ন দেখেই তো আর টিকতে পারলাম না, চলে অ্যালাম। কানুকে বল্লাম, নিয়ে চল্ ভাই গুপ্তীনাথপুর, মাথায় থাকুন বাবা বিশ্বনাথ—মুংলি কোথায়? ওকে কচি বাঁশপাতা খাওয়াবো নিজের হাতে, স্বপ্ন দেখিচি।

একটু পরে ন'ঠাকরুণ দড়া ধরে মুংলিকে নিয়ে এলেন। সত্যিই তার সে চেহারা নেই। সব কাজ ফেলে দ্রব ঠাকরুণ ছুটে গিয়ে তার গায়ে-মুখে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন। মুংলির চোখে জল পড়ে, তাঁরও চোখে জল পড়ে।

ন'ঠাকরুণ বল্লেন—আর-জন্মে ও তোমার মেয়ে ছিল দিদি—আর-জন্মের মায়ার বাঁধন—

—রক্ষে করো ন'বৌ—তুমিও বড় বড় কথা বলতে শুরু করলে নাকি, সেই মাগীর মত? মুংলি এ জন্মেই আমার মেয়ে—আর জন্ম-টন্ম ছেড়ে দাও।

—কে মাগী, কার কথা বলচো—

—সে বলবো এখন সব। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি দেশে এসে—বাবাঃ—

কানু হেসে বল্লে—নাঃ, ঠাকুমাকে নিয়ে আর পারা গেল না—এমন নাস্তিক—কাশীপ্রাপ্তি অদৃষ্টে থাকলে তো?

—তুই ভাই বস্, ন'বৌ বলো—আমার এই ভিটেতেই যেন তোদের কোলে শুয়ে সকলের কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে যেতে পারি। কাশী পেরাপ্তিতে দরকার নেই—এই ভিটেই আমার গয়া কাশী। তিনি এই উঠোনের মৃত্তিকেতে শুয়েছিলেন ওই তুলসীতলায়—আমাকেও তোরা ওখানে—

আঁচলের খুঁট দিয়ে দ্রব ঠাকরুণ চোখের জল মুছলেন।

বেলা যায় যায়—আষাঢ়ান্ত সুদীর্ঘ দিনমানের শেষে সূর্য্য ঢলে পড়েচে পশ্চিম দিকের নিবিড় বাঁশবনের আড়ালে। ঘেঁটকোল ফুল কোথাও জঙ্গলে ফুটেচে, বাতাসে তার কটু উগ্র গন্ধ। দ্রব ঠাকরুণের মন শান্তিতে, আনন্দে, উৎসাহে পূর্ণ হয়ে গেল। এগারো বছরের নববধূ এই বাড়ীর উঠানে পা দিয়েছিলেন, এখন তাঁর বয়েস তিন কুড়ি ছয়।

কনক হাসিমুখে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে—ঠাকুমা ভালো আছেন? এয়েচেন শুনে ছুটে দেখতি আলাম—আমাদের কথা মনে ছিল?

ক্যান্‌ভাসার কৃষ্ণলাল

চাকুরী গেল। এত করিয়াও কৃষ্ণলাল চাকুরী রাখিতে পারিল না। সকাল হইতে রাত দশটা পর্যন্ত (ডাউন খুলনা প্যাসেঞ্জার, ১০-৪৫ কলিকাতা টাইম) টিনের সুটকেস্ হাতে শিয়ালদ' হইতে বারাসত এবং বারাসত হইতে শিয়ালদ' পর্যন্ত 'তাঁতের মাকু'র মত যাতায়াত করিয়া ও ক্রমাগত "দত্তপুকুরের বাতের তেল, দত্তপুকুরের বাতের তেল—বাত, বেদনা, ফুলো, কাটা ঘা, পোড়া ঘা, দাঁত কনকনানি, এক কথায় যত রকম ব্যথা, শূলানি, কামড়ানো আছে সব এক নিমেষে চলে যাবে—আজ চব্বিশ বছর এই লাইনে ওষুধটি প্রত্যেক ভদ্রলোক ব্যবহার করচেন, সকলেই এর গুণ জানেন—" বলিয়া চিৎকার করিয়াও চাকুরী রাখা গেল না।

সেদিন বসু মহাশয় (ইণ্ডিয়ান ড্রাগ সিণ্ডিকেটের মালিক নৃত্যগোপাল বসু) কৃষ্ণলালকে ডাক দিয়া বলিলেন—পাল মশায়, কাল রাত্রের ক্যাশ জমা দেন নি কেন?

—আজ্ঞে, আজ্ঞে—অনেক রাত হয়ে গেল—খুলনার ট্রেন—প্রায় বিশ মিনিট লেট্।

—দেখুন, আগেও আমি অন্তত সতেরো বার আপনাকে সাবধান করে দিয়েচি। খুলনা ট্রেন দশটা, একুশে স্টেশনে আসে। আমি সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত অফিসে বসে ছিলাম শুধু

আপনার জন্যে। নিতাই দুবার স্টেশনে দেখে এল ট্রেন রাইট-টাইমে এসেচে। লেট এক মিনিটও ছিল না—

—আজ্ঞে বড়বাবু, শরীরটা কাল বড়ই—

—ও আপনার পুরানো কথা। ও কথা আর শুনবো না আজ। যাক, ক্যাশ এনেচেন এখন?

কৃষ্ণলাল অপরাধীর মত বড়বাবুর মুখের দিকে চাহিল। বলিল—ক্যাশটা আনিগে যাই—না—একটু মুশকিল হয়েচে, আচ্ছা আসি—

—যান আসুন—

কৃষ্ণলাল তবুও দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া নিত্যগোপালবাবু বলিলেন—কি হ'ল!

—আজ্ঞে ওবেলা দেবো ওটা। বাসায় এনে রেখেছিলাম, চাবি দিয়ে বেরিয়ে গিয়েচে, আমি যার সঙ্গে থাকি।

—আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

—একটু বেড়াতে বার হয়েছিলাম ওই গোলদীঘির দিকে—

—সব বাজে কথা। আমি বিশ্বাস করিনে। কেন করিনে তাও আপনি জানেন। রাত দশটার পরেই ক্যাশ এনে দেওয়ার কথা—আপনি বুড়ো হয়ে গেলেন এই ক্যানভাসারের কাজ ক'রে। জানেন না যে ক্যাশ তখুনি জমা দেওয়ার নিয়ম আছে?

—আজ্ঞে, আজ্ঞে—

—এ রকম আরও কতবার হয়েচে বলুন দিকি? আপনার কথার ওপর বিশ্বাস করা যায় না আর। বড়ই দুঃখের কথা। আপনি আমাদের পুরানো ক্যানভাসার ব'লে আপনার অনেক দোষ সহ্য করেচি আমরা। কিন্তু এবার আর নয়। আপনি এ মাসের এই ক'দিনের মাইনে নিয়ে যাবেন আপিস খুললে—কমিশনের হিসেবটাও সেই সঙ্গে দেবেন। যান এখন।

অবশ্য এত সহজে কৃষ্ণলাল যাইতে রাজি হয় নাই—নিত্যগোপালবাবুকে সে যথেষ্টই বলিয়াছিল, নিত্যগোপালবাবুর বুড়োকর্ত্তাকে গিয়া পর্য্যন্ত ধরিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত কিছুই হইল না।

মুশকিল এই, চাকুরী যখন যাইবার হয়, তখন তাহাকে কিছুতেই ধরিয়া রাখা যায় না। মৃত্যুপথযাত্রী মানবের মতই তার গতিপথ নির্ম্মম, ধরাবাঁধা!

সুতরাং চাকুরী গেল।

তখন বেলা আড়াইটা। সকাল হইতে ইহাকে উহাকে ধরাধরির ব্যাপারেই এতক্ষণ সময় কাটিয়াছে। স্নান-আহার হয় নাই।

২৫।২ রামনারায়ণ মিত্রের লেনে ঢুকিয়াই যে টিনের চালওয়ালা লম্বা দোতলা মাটির ঘর, অর্থাৎ যে মাঠকোঠার ঠিক সামনেই আজকাল কর্পোরেশনের সাধারণ স্নানাগার নির্ম্মিত হইয়াছে—তারই পশ্চিম কোণে সতেরো নম্বর ঘরে আজ প্রায় এগারো বছর ধরিয়া কৃষ্ণলালের বাসা।

কৃষ্ণলাল ঘরে একা থাকে না। ছোট্টঘরে তিনটি ময়লা বিছানা মেজের উপর পাতা। সে ঢুকিয়া দেখিল ঘরে কেবল যতীন শুইয়া ঘুমাইতেছে। আর একজন কমমেট্ ট্রামের কণ্ডাক্টার, সাড়ে চারটার পরে সে ডিউটি হইতে ছুটি লইয়া একবার আধঘণ্টার জন্য বাসায় আসে এবং তারপরই সাজিয়া-গুজিয়া কোথায় বাহির হইয়া যায়।

নীচে পাইস্ হোটেলে ইহাদের খাইবার বন্দোবস্ত।

কৃষ্ণলালের সাড়া পাইয়া যতীনের ঘুম ভাঙিয়া গেল।

সে বলিল—এত বেলায় ?

—বেলায় তা কি হবে ? চাকরীটা গেল আজ।

—সে কি ! এতদিনের চাকরীটা—

—কত করে বল্লুম বড়বাবুকে। তা শোনে কি কেউ ? গরীবের কথা কে রাখে বলো !

—হয়েছিল কি ?

—ক্যাশ জমা দিতে দেরি হয়েছিল। বলে, তুমি ক্যাশ ভেঙেচ।

—তাই তো···তাহোলে এখন উপায় !

—দেখি কোথাও আবার চেষ্টা—জুটে যাবে একটা না একটা। আমাদের এক দোর বন্ধ হাজার দোর খোলা—আমাদের অন্ন মারে কে।

সামান্য কিছু পয়সা হাতে ছিল—পাইস্ হোটেল হইতে শুধু ডাল-ভাত খাইয়া আসিয়া কৃষ্ণলাল কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিল, পরে নবীন কুণ্ডু লেনে একটি খোলার বাড়ীতে ঢুকিয়া ডাক দিল—ও গোলাপী—গোলাপী—

তাহার সাড়ায় যে বাহির হইয়া আসিল, সে বর্ত্তমানে রূপযৌবনহীনা প্রৌঢ়া, পরনে আধ ময়লা খয়েরী রংয়ের শাড়ী, হাতে গাছকয়েক কাঁচের চুড়ি। দু-গাছা সোনাবাঁধানো পেটি। মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে, গায়ের রং এখনও বেশ ফর্সা।

গোলাপীকে ত্রিশ বছর আগে দেখিলে ঠিক বোঝা যাইত গোলাপী কি ছিল। এখন আর তাহার কি আছে ? কৃষ্ণলাল তখন সবে ঔষধের ক্যানভাসারের পদে বহাল হইয়াছে—তাহার চমৎকার চেহারা ও কথাবার্ত্তা বলিবার ভঙ্গিতে রেলগাড়ীর প্যাসেঞ্জার কি করিয়া সহজেই ভুলিয়া যাইত—জলের মত পয়সা আসিতে লাগিল।

এই নবীন কুণ্ডু লেনেই অন্য এক বাড়ীতে এক বন্ধুর সহিত আসিয়া সে গোলাপীকে দেখে। তখন নতুন যৌবন, হাতেও কাঁচা পয়সা। গোলাপীর বয়স তখন যোলো সতেরো ; রূপ দেখিয়া রাস্তার লোক চমকিয়া দাঁড়াইয়া যায়। গোলাপীর মার হাতে বছরে বছরে মোটা টাকা জমে। কৃষ্ণলাল সেই হইতেই নবীন কুণ্ডু লেনের নৈশ অধিবাসী। কত কালের কথা।—গোলাপীর ঘরে মেহগ্নি কাঠের দেরাজ হইল, ঘরের দেওয়ালে বিলম্বিত বড় বিলাতি কাচ বুলানো আয়না হইল, সেকালে প্রচলিত ম্যাকাসার অয়েলের শিশির পর শিশি ভিড় জমাইয়া তুলিল—বাতায়ন মালতী ফুলের টবে সজ্জিত হইয়া বাড়ীর অন্যান্য ঘরের অধিবাসীদের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করিল।

কাঁচা পয়সা কৃষ্ণলালের হাতে। প্রতিদিনের আয় তিন টাকা, আড়াই টাকার নীচে নয়।

একদিন গোলাপীর মা অভিমানের সুরে বলিল—যাই বলো বাপু, গোলাপী আমায় প্রায়ই বলে, একখানা বাড়ী তার নিজের না হ'লে চলে না আর তা তেমন কপাল কি—এই এক বাড়ীতে ছত্রিশ জনার সঙ্গে—

—কেন মা? তার ভাবনা কি? কালই ঘর দেখে দিচ্চি—

—কত টাকা ভাড়ার মধ্যে হবে বলো—এই আমাদের পাড়াতেই আছে—

—যা তুমি বলবে। কুড়ি কি পঁচিশ—

—ত্রিশ টাকায় একখানা ভালো বাড়ী এ পাড়াতেই আছে—তাহ'লে তাই না হয়—

—হ্যাঁ হ্যাঁ—এ আবার আমায় জিজ্ঞেস করতে হয় মা?

গোলাপীরা নতুন বাড়ীতে উঠিয়া আসিল। বড় পাঁচী বলিল—ওলো, একটু রয়ে সয়ে নিস—দেখিস যেন আবার দড়ি না ছেঁড়ে—খুব বরাত তোর যাহোক গোলাপী। আর আমাদের ওই বুড়ো রায় বাবু রোজ আসেন আর বাঁধানো দাঁত জলের গেলাসে খুলে রাখেন—ক'দিন বল্লাম একখানা ঢাকাই শাড়ী, আর একটা বাজা-ঘড়ি দাও দেওয়ালে টাঙানোর, তা বুড়ো মড়া আজ সাতমাস ঘুরুচ্চে—আজ এলে হয় একবার—ওর দাঁত খুলে জলের গেলাসে ডুবিয়ে রাখা বের করে দেবো—

শুধু বাড়া? গোলাপীর টেবিল-হারমোনিয়ম হইল, জোড়া জোড়া শাড়ী, চেয়ার, এমন কি শেষে কলের গান পর্য্যন্ত। কোন সুখ গোলাপীর বাকি ছিল? প্রতি রবিবারে কৃষ্ণলালের সঙ্গে গাড়ী করিয়া (অবশ্য ঘোড়ার গাড়ী) কালিঘাটে গঙ্গাস্নান ও দেবীদর্শন করিতে যাওয়া তাহার অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। বছরের পর বছর কাটিয়া গেল।

গোলাপী আর কৃষ্ণলাল, কৃষ্ণলাল আর গোলাপী।

ইতিমধ্যে গোলাপীকে সুখে-স্বচ্ছন্দে প্রতিষ্ঠিতা দেখিয়া তাহার মা একদিন নবীন কুণ্ডু লেনের মায়া কাটাইয়া বোধ হয় উর্ব্বশী বা তিলোত্তমা-লোকে প্রস্থান করিল। অমন জাঁকের শ্রাদ্ধ এ অঞ্চলে কেহ দেখে নাই তার আগে।

ক্রমে ক্রমে গোলাপীর যৌবনে ভাঁটা পড়িল। কৃষ্ণলালেরও আয়ের অঙ্ক কমিতে লাগিল। দত্তপুকুরের তেলের অনুকরণে শত শত বাতের তেল বাজারে বাহির হইল—রেলগাড়ীর কামরাও নিত্যনূতন ক্যানভাসারে ভরিয়া গেল। যা ছিল কৃষ্ণলালের একার—তাহার মধ্যে অনেক ভাগ বসিল। পূর্ব্বের সচ্ছলতা কমিতে লাগিল।

তারপর দশ বারো বছর কাটিয়া গিয়াছে।

এই দশ বারো বছরে সুন্দরী গোলাপী কুরূপা প্রৌঢ়াতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—তাহার সে বাড়ী চলিয়া গিয়া আবার সাত আটটি নানা বয়সের সঙ্গিনীর সঙ্গে বাড়ীটিতে থাকিতে হয়! তবুও কৃষ্ণলালের যাহা কিছু উপার্জ্জন, এইখানেই তাহার সদ্ব্যয়। গোলাপীও তাহা বোঝে—এই ত্রিশ বছরের মধ্যে সে কৃষ্ণলালকে ছাড়িয়া এক কোথাও যায় নাই।

কৃষ্ণলাল বলিল—গোলাপী, চাকরীটা গেল !

গোলাপী বিস্ময়ের সুরে বলিল—সে কি গা !

—বড়বাবু রাগ করেচে, কাল ক্যাশ জমা দিইনি বলে।

—কি করলে সে টাকা ?

—খরচ হয়ে গেল।

—কোথায় খরচ হয়ে গেল—কিসে খরচ হয়ে গেল ? তোমার এখনও দোষ গেল না তা ওরা কি করে রাখে তোমায় ? কাল কোথায় গিয়েছিলে ?

—সে খরচ নয় গোলাপী। দক্ষিণেশ্বর সেদিন যাওয়ার দরুন দেনা ছিল মনে নেই ? কাবুলীর কাছ থেকে টাকা নিইনি ? রাত দশটার পরে ইষ্টিশনের গেটে আমায় ধরেচে। রুপী দেও। শেষে ভাবলাম কি ছোরা মারবে না কি ? ভয়ে পড়ে দিয়ে দিলাম টাকা। কাবুলীর দেনা, ও হজম করা কঠিন।

—তা নেও বেশ হয়েচে। এখন খাওয়া হয়েচে, না হয়নি ? আমার অদেষ্টে ঝি-গিরি নাচ্‌চে সে তো দেখতে পাচ্চি। বল্লু, পাড়াগাঁয়ের দিকে চলো—কোথাও একখানা ঘরদোর বেঁধে দু'জনে থাকা যাবে—তা না, তোমার বাপু কলকেতা আর কলকেতা ! কলকেতা ছেড়ে আমি থাকতে পারবো নি। এখন থাকো কলকেতায় ? কে এখানে খাওয়ায় দেখি।

—জুটে যাবে, এখানেই জুটে যাবে। অত ভাবনার কারণ নেই—

—তোমার এ বুড়ো বয়সে চাকরী নিয়ে তোমার জন্যে বসে আছে ! এখন আর কি তোমার হাত পা নেড়ে বক্তিমে করবার গতর আছে নাকি ?

—দেখিয়ে দেবো গোলাপী, দেখবি ? ভদ্রমহোদয়গণ, এই সেই বিখ্যাত আদি ও অকৃত্রিম দত্তপুকুরের বাতের তেল—ইহা ব্যবহারে সর্বপ্রকার বাত বেদনা, মাথাধরা, দাঁত কনকনানি, কাউর, ছুলি, কাটা ঘা, পোড়া ঘা—

গোলাপী হাসিতে হাসিতে বলিল—থাক গো গোসাঁই, আর বিদ্যে দেখাতে হবে না··· সবাই জানে তুমি খুব ভালো বক্তিমে দিতে পারো—আহা, কি হাত পা নাড়ার ছিরি ! যেন থিয়েটারের এ্যাক্টো করচেন !

—তাহ'লে বল চাকুরীতে নেবে কিনা ?

—নেবে না আবার ? একশো বার নেবে—আমি যাই এখন ঝি-গিরি ক'রে নিজের পেট চালাবার চেষ্টা দেখি—নিজেই খেতে পাবে না তা আমায় আর খাওয়াবে কোত্থেকে ! কি অদেষ্ট যে নিয়ে এসেছিলাম !

কৃষ্ণলাল চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া গোলাপী বলিল—ব'সো, দুটো মুড়িটুড়ি দেখে দি—খেয়ে একটু চা খেয়ে যাও—

অগত্যা কৃষ্ণলাল বসিল। বলিল—তাহ'লে বক্তৃতা এখনও দিতে পারি, কি বলো ?

—নেও, আর আদিখ্যেতায় কাজ নেই। দিতে পারো তো—সত্যি কথা যদি বলি তবে

তো পায়া ভারী হয়ে যাবে।

—কি বলো না গোলাপী, বলতেই হবে।

—তোমার মত অমন কারো হয় না, আমি তো কতই দেখলাম দাঁতের মাজনের, ওষুধের ফিরিওয়ালা—আমাদের এই গলির মুখে হারমোনিয়াম গলায় বেঁধে নাচে, বক্তিমে দেয় পোড়ারমুখোরা—কিন্তু সে সব ফিরিওয়ালা তোমার মত নয়—

কৃষ্ণলাল রাগের সুরে বাধা দিয়া বলিল—কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা! তোকে নিয়ে আর পারিনে দেখচি—তারা হ'ল ফিরিওয়ালা—আমরা হলুম ক্যান্‌ভাসার—হারমোনিয়াম পিঠে বেঁধে যারা গান গেয়ে ঘুঙুর পায়ে দিয়ে নেচে বেড়ায়, আমরা কি সেই দলের? অপমান হয়, ওকথা আমাদের ব'লো না!

—যাক যাক, ভুল হয়েচে, তুমি এখন ঠাণ্ডা হয়ে বসে চা খেয়ে নেও।

গোলাপীর মন আজ বেশ খুশি। কতদিন পরে যেন যুবক কৃষ্ণলালের অঙ্গভঙ্গি ও সুন্দর সতেজ গলার স্বর সে আবার শুনিল। ত্রিশ বৎসরের অন্ধকার কালো ছেঁড়া পর্দাটা কে টানিয়া সরাইয়া দিল।

সে যত্ন করিয়া কৃষ্ণলালকে খাওয়াইল—কৃষ্ণলাল বিদায় লইয়া যখন আসে তখন বলিল—একটা কথা বলি শোনো। যদি খাওয়া-দাওয়ার কোনো কষ্ট হয়, তবে আমার কাছে এসে অবিশ্যি খেয়ে যাবে। এই বৃদ্ধি বয়েসে না খেলে শরীর থাকবে কেন? আমায় কিছু দিতে হবে না এখন। ওই সোনারবেনেদের ঠাকুরবাড়ীতে একটা ঝিয়ের দরকার, সকাল-সন্ধ্যে কাজ করব—আমি কাল থেকে সেখানে কাজে লেগে যাবো—তা তোমায় বলাও যা না বলাও তাই—তুমি কি আসবে? তোমায় আমি চিনি কিনা!

কৃষ্ণলাল হাসিয়া বলিল—ভালোই তো। তোর রোজগার এইবার খাই দিনকতক—সে সাধ আমার আছে অনেকদিন থেকেই। আচ্ছা তাহ'লে এখন আসি, ওবেলা হয়তো আসবো—সন্ধ্যের পর।

তাহার পর এক মাস কাটিয়া যায়। কিন্তু গোলাপীর বাড়ী কৃষ্ণলাল আর আসিল না। সুখের দিনে গোলাপীকে সে অনেক দিয়াছে—এখন দুঃখের দিনে বসিয়া বসিয়া গোলাপীর অন্ন ধ্বংস করিবে তেমন-বংশে জন্ম নয় কৃষ্ণলালের। বিশেষত দেখিতে হইবে, গোলাপীও প্রৌঢ়া—ঝি-গিরি ভিন্ন এখন আর তার কোনো উপায় নাই।

মেসের ভাড়া বাকি পড়িয়াছিল দু'মাসের, মেসের অধ্যক্ষ কৃষ্ণলালকে ডাকিয়া বলিল—কি কৃষ্ণবাবু, আমাদের রেন্টটা কি হবে?

—আজ্ঞে ক্ষেত্রবাবু, দেখতেই তো পাচ্চেন—চাকুরীটা গেল, হাতে কিছু নেই। এ অবস্থায়—

—ফি-মাসে আমি পকেট থেকে ঘরভাড়া যোগাবো কোথা থেকে সেটাও তো দেখতে হবে? দুদিন সময় নিন—তারপর আপনি দয়া করে সিট ছেড়ে দিন, আমি অন্য ব্যবস্থা দেখি।

কৃষ্ণলাল পড়িল মহা বিপদে। একে খাইবার পয়সা নাই—তাহার উপর মাথা গুঁজিবার যে জায়গাটুকু ছিল, তাহাও তো আর থাকে না। তিনদিন কাটিয়া গেল, দু'একটি পূর্ব্ব-পরিচিত বন্ধুর নিকট হইতে চাহিয়া-চিন্তিয়া দু'চার আনা ধার লইয়া পাইস হোটেলের ডাল-ভাতে কোনোরকমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া এই তিনদিন কাটাইল। কিন্তু তিনদিন পরে তাহার সত্যই অনাহার শুরু হইল। দু' পয়সার ছাতু বা মুড়ি সারাদিনে—শুধু ছাতু, একটু গুড় বা চিনি জোটে না তাহার সঙ্গে। তাহার পর পেট পুরিয়া জল, কলের নির্ম্মল জল।

মেসে ম্যানেজার আবার ডাক দিলেন। বলিলেন—কিছু হ'ল?

—আজ্ঞে এখনো—এই ভাবচি—

—আমার লোক এসে গিয়েচে—কাল মাসের পয়লা। দু'মাসের ভাড়া পকেট থেকে দিয়েচি—এ মাসেরও দিতে হবে। আমিও ছা-পোষা মানুষ মশাই—কত লোকসান হজম করি বলুন? আপনি জিনিসপত্তর নিয়ে চলে যান—আমার ভাড়ার দরকার নেই।

পরদিন সকালেই জিনিসপত্র সমেত (একটা টিনের ট্রাঙ্ক ও একটি ময়লা বিছানা) কৃষ্ণলালকে পথে দাঁড়াইতে হইল। বর্ষাকাল। জিনিসপত্র রাখিবার মত জায়গা কোথায় পাওয়া যায়? গোলাপী অনেকবার মেসে খবর লইয়াছে—মধ্যে একদিন দু'ঘণ্টা মেসের বাহিরের ফুটপাতে বসিয়া ছিল তাহার অপেক্ষায় (কারণ ম্যানেজার তাহাকে চেনে, মেসে কুচরিত্রা স্ত্রীলোক ঢুকিতে দিবে না)—কৃষ্ণলাল দূর হইতে দেখিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। এখন গোলাপীর বাড়ী গেলে সে কান্নাকাটি করিবে, আটকাইয়া রাখিতে চাহিবে। নতুবা সেখানে জিনিসপত্র রাখা চলিত।

মেস হইতে কিছু দূরে বড় রাস্তার উপর একটা চায়ের দোকানের মালিকের সঙ্গে কৃষ্ণলালের পরিচয় ছিল। বলিয়া কহিয়া সেখানে কৃষ্ণলাল জিনিসপত্র আপাতত রাখিয়া দিল। তাহার পর উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ দেখিল সে গঙ্গার ধারে আহিরিটোলার ষ্টীমারঘাটে আসিয়া পড়িয়াছে।

সকাল হইতে কিছু খাওয়া হয় নাই। ঘাটের ধারে একটা গাছতলায় হিন্দুস্থানী ফিরিওয়ালা ভুট্টা পোড়াইতেছে। কৃষ্ণলাল এক পয়সার ভুট্টা কিনিয়া জলের ধারে বসিয়া সেটি পরম তৃপ্তির সহিত খাইল।

একটা বিড়ি পাইলে হইত এই সময়।

এই সময় একটি ছোকরা ব্যাগহাতে আসিয়া তাহার পাশে ব্যাগটি নামাইয়া পকেট হইতে ঝাড়ন বাহির করিয়া সিমেণ্ট-বাঁধানো রানার উপর পাতিল। বসিতে যাইবে এমন সময় ছোকরা হঠাৎ পকেটে হাত দিয়া কি দেখিয়া একবার চারিদিকে চাহিল এবং কাছেই কৃষ্ণলালকে দেখিয়া বলিল—একটু দয়া করে ব্যাগটা দেখবেন? এক পয়সার বিড়ি কিনে আনি—

বিড়ি কিনিয়া আনিয়া সে কৃষ্ণলালকে একটি বিড়ি দিল। কৃষ্ণলাল আগেই আন্দাজ

করিয়াছিল, ছোকরা একজন ক্যান্‌ভাসার। এখন জিজ্ঞাসা করিল—আপনি বুঝি ক্যান্‌ভাস করেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—কি জিনিস?

—হাতকাটা তেল—সাজ্জিক্যাল মলম—

—বেশ পাওয়া যায়? কমিশন কেমন?

—ভালোই। খদ্দেরকে হাত কেটে দেখাতে—সঙ্গে ছুরি থাকে—এই যে—

ছোকরা জামার আস্তিন গুটাইয়া দেখাইল—কব্জি হইতে কনুই পর্যন্ত হাতের সমস্ত অংশটা ছুরি দিয়া ফালা ফালা করিয়া চেরা। কৃষ্ণলাল শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—এ কি! লাগে না?

ছোকরা হাসিয়া বলিল—লাগে—আবার মলম লাগালে সেরে যায়।

—কি রকম আয় করেন?

—চব্বিশ টাকা থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকা মাসে।

কৃষ্ণলালের মন বেজায় দমিয়া গেল। এত কাণ্ড করিয়া ত্রিশ টাকা! অথচ এমন সময় গিয়াছে—যখন দত্তপুকুরের বাতের তেল ফিরি করিয়া সে মাসে ষাট সত্তর টাকা অনায়াসে রোজগার করিয়াছে—তাহার জন্য নিজের হাত ছুরি দিয়া ফালা ফালা করিয়া কাটিবার প্রয়োজন হয় নাই।

ক্যানভাসারের কাজে আর সুখ নাই। আর সে এ কাজ করিবে না।

পরদিন কৃষ্ণলাল কলিকাতা ছাড়িয়া স্বগ্রামে রওনা হইল। বসিরহাট স্টেশনে নামিয়া সাত ক্রোশ হাঁটিয়া তাহার পৈতৃক গ্রাম ইলশেখালি পৌঁছিতে বেলা তিনটা বাজিল। গ্রামে তাহার দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি ছাড়া অন্য কেহ আপনার জন নাই—নিজের পৈতৃক ভিটা জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে। বহুদিন এদিকে আসে নাই, দেখা-শোনাও করে নাই—খড়ের ঘর কতদিনে টেকে? আজ প্রায় সতেরো আঠারো বছর পূর্ব্বে দু পাঁচ দিনের জন্য একবার পিসিমার শ্রাদ্ধে গ্রামে আসিয়াছিল। সেই আর এই।

জ্ঞাতিরা অবশ্য কৃষ্ণলালকে জায়গা দিল। কিন্তু কিছুদিন থাকিয়া কৃষ্ণলালের কেমন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। গ্রামে তাহার মন টেকে না। কখনও সে দীর্ঘদিন ধরিয়া গ্রামে বাস করে নাই—এখানকার লোকে কথাবার্ত্তা বলিতে জানে না, ভাল করিয়া মিশিতে জানে না, চা খায় না। কলিকাতায় রাস্তার ভিখারীও চা খায়। তাহার উপর এই পাড়াগাঁয়ে যেমন জলকাদা, তেমনি জঙ্গল রাত্রে মশার উৎপাতে নিদ্রা হয় না। এর মধ্যে ম্যালেরিয়া প্রায় সকল বাড়ীতেই দেখা দিয়াছে।

না, এখানে মন টেকে না। কৃষ্ণলাল চেষ্টা করিয়া দেখিল—এখানে সবাই যেন সারাদিন ঘুমাইয়া আছে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ইহারা চণ্ডীতলায় ক্ষুদ্র মাঠে বেলতলায় বসিয়া হুঁকা হাতে আড্ডা দেয়, পরচর্চ্চা করে। কোনো কাজ নাই অথচ দুপুরে ভাত দু'টি মুখে

দিতে না দিতে এদের চোখ ঘুমে ঢুলিয়া পড়ে। দিবানিদ্রা চলে বেলা চারিটা পর্য্যন্ত—তারপর ঘুম হইতে রক্তবর্ণ চোখে উঠিয়া কেহ বা বাজারে দু'পয়সার সওদা করিতে যায়—সেখানেও আবার আড্ডা···এ দোকানে ও দোকানে বসিয়া তামাক খাওয়া···চার পয়সার সওদা করিতে তিন ঘণ্টা লাগাইয়া সন্ধ্যার পর বাড়ী আসে। তারপরই আহার ও নিদ্রা। কেরোসিন তেলের দাম চড়িয়া গিয়াছে—তেল খরচ করিয়া আলো জ্বালাইয়া রাখিতে কেহ রাজী নয়। কয়েক বাড়ী যাও—অন্ধকারে বসিয়া দু'একটা কথা বলো, গল্প করো—এক আধ কল্কে তামাক খাও—তাহার পর বাড়ী ফিরিয়া আবার বিছানা আশ্রয় কর। দিন শেষ হইয়া গেল।

কৃষ্ণলাল এরকম জীবনে অভ্যস্ত নয়। এ কি জীবন? অথচ সকলেই বলিবে, দাদা, সংসার আর চলে না, বড় কষ্ট। কষ্ট ঘুচাইবার চেষ্টা কোথায়? আজ দীর্ঘ পঁচিশ ত্রিশ বছর ধরিয়া যার কলিকাতায় ভীষণ কর্ম্মব্যস্ত জীবন কাটিয়াছে, এ ধরনের অলস, শ্রমবিমুখ জীবনের ধারণাই করিতে পারে না সে।

সকালে উঠিয়াই নীচের তলার কলে স্নান সারিয়া লইতে হইত। খুব ভোরে স্নান না সারিলে এমন ভিড় জমিয়া যাইবে কলে যে, আর স্নান করা চলিবে না। নীচের তলায় সেকরার দোকানের লোকেরা, শালওয়ালা, দরজি, পুব দিকের ঘরে যে মুটেরা থাকে সবাই আসিয়া কলে ভিড় লাগাইয়া দিবে, ইহার পর আসিবে একদল বালতি হাতে জল ধরিতে ও চাউল ধুইতে। সারি সারি লোক দাঁড়াইয়া যাইবে কলসী হাতে জল ভরিতে। ওপরে তিনতলায় তিনটি মেসের চাকরেরা। সকলেই কর্ম্মব্যস্ত, ঘড়ি ধরিয়া কাজ কলিকাতায়, 'সময় গেল। ছ'টা বাজে, কখন কি হবে?' দিন আরম্ভ হইয়াছে···এখনি বাবুরা আসিয়া ভাত চাহিবে আটটা বাজিতে না বাজিতে, এতটুকু দেরি করিলে চলিবে না।

স্নান সারিয়া কৃষ্ণলাল ব্যাগ হাতে বাহির হইত শেয়াল-দ' স্টেশনে, প্রথমেই সাতটা দশ বারাসত, সাতটা পঁচিশ নৈহাটি, পৌনে আটটা রাণাঘাট প্যাসেঞ্জার, সাড়ে আটটা বনগাঁ লোকাল, আটটা পঞ্চাশ দত্তপুকুর, ন'টা দশ কেষ্টনগর লোকাল,···শুরু হইয়া গেল দিনের কাজ। বাতের তেল! বাতের তেল! দত্তপুকুরের বাতের তেল! যত প্রকার বাত, ফুলা, শূলানি, কন্‌কনানি, মাথা ধরা, পেট বেদনা, ইহার একমাত্র ব্যবহারে···ভদ্রমহোদয়গণ, এই ওষুধটি আজ ত্রিশ বছর যাবৎ এই লাইনে সুখ্যাতির সহিত চলিতেছে,—এই চলিল বেলা বারোটা পর্য্যন্ত। বারোটা পঞ্চান্ন শান্তিপুর ছাড়িয়া গেলে তবে সকালের কাজ মিটিল। কি জীবন! কি আনন্দ! কি পয়সা রোজগার! কাঁচা পয়সা রোজ আসে, রোজ সন্ধ্যায় উড়িয়া যায়, যে পয়সা আয় করিতে জানে, সে-ই জানে খরচ করিতে, ইহাতে ক্ষোভ কি?

কৃষ্ণলাল আরও মাসখানেক কোনোরকমে কাটাইল।

আর চলে না। এ অলস জীবন তাহার অসহ্য, কখনো পা গুটাইয়া কূর্ম্মবৃত্তি অবলম্বন করিয়া এভাবে সে থাকে নাই। বেশিদিন এভাবে থাকিলে সে পাগল হইয়া যাইবে, নয়তো

মরিয়া যাইবে।

কিন্তু কলিকাতায় গিয়া সে খাইবে কি? কোন উপায় তো দেখা যাইতেছে না। ইণ্ডিয়ান ড্রাগ সিণ্ডিকেটে আর চাকরী হইবার সম্ভাবনা নাই। তবুও একবার বসু মহাশয়কে গিয়া ধরিয়া দেখিলে কেমন হয়? কিছু যদি না জোটে, তবে আহিরিটোলার ঘাটে সেই হাতকাটা তেলের ক্যান্‌ভাসার ছোকরার সঙ্গে দেখা করিয়া···তবে ছুরি দিয়া নিজের হাতটা ফালা ফালা করিয়া কাটা—এ বৃদ্ধ বয়সে, ক্যান্‌ভাসারের চাকুরীর মত সম্মানের চাকুরীর, আরামের চাকুরী আর নাই, কিন্তু হাত কাটিয়া দেখাইয়া জিনিস বিক্রয় করা? ওতে মান-সম্ভ্রম থাকে না।

এভাবে গ্রামে বসিয়া থাকা জীবন নয়। চিরকাল কাজের মধ্যে থাকিয়া আজ বাঁচিয়া মরিয়া থাকা তাহার পোষাইবে না। গ্রামেও তো হাওয়া খাইয়া জীবনধারণ করা যায় না—কেহ কেহ তাহাকে সামনের বছর দু'এক বিঘা ধান করিতে পরামর্শ দিল—কেহ বলিল, ডোবার ধারে জমিটা পড়ে আছে কেষ্ট খুড়ো, তোমারই পৈতৃক জমি, এই শীতকালে মানকচু লাগাও ওটাতে, তবু হাটে হাটে কিছু ঘরে আসবে, সামনের শীতকাল লাগাৎ—কৃষ্ণলালের হাসি পায়।

কলিকাতার রোজগার যে কি ধরণের, সেখানে ক্যান্‌ভাসারের কাজে মাসে যে টাকা এক সময় তাহার আয় ছিল, এখানে গোটা বছর ধরিয়া কচু, কুমড়া বেচিয়াও যে সে আয় হওয়া অসম্ভব—এই মূর্খ, অর্ব্বাচীনেরা তাহা কি করিয়া বুঝিবে?

অবশেষে সে একদিন বাক্স বিছানা বাঁধিয়া কলিকাতায় আসিয়া হাজির হইল।

বাঁচিতে হয় তো ভাল করিয়াই সে বাঁচিবে!

ট্রেনে পুরানো ক্যান্‌ভাসারদের সঙ্গে দেখা। নবশক্তি ঔষধালয়, কবিরাজ অনঙ্গমোহন দেব, বিশ্বাস কোম্পানী—ইণ্ডিয়ান ড্রাগ সিণ্ডিকেট প্রভৃতি ফার্ম্মের লোক সব। সবাই জানে, সবাই খাতির করে।

—আরে, এই যে কেষ্টদা, আজকাল আর দেখিনে যে?

—কেষ্টদা, কোত্থেকে? বিয়েথাওয়া করলেন নাকি এ বয়সে?

—আজকাল কোন কোম্পানীতে আছেন কেষ্টদা? দেখিনে ট্রেনে আর?

—জমিজমা দেখতে গেছলে ভায়া? তা দেখবেই, তো, থাকলেই দেখে—আমাদের কোন চুলোয় কিছু নেই, যা করে এই বিশ্বাস কোম্পানী, হিংসে হয় তোমায় দেখে, দু'শো টাকা বছরের আয়ের সম্পত্তি? বলো কি! তবে তো তুমি—

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কৃষ্ণলালকে এ বিড়ি দেয়, ও পানের কৌটা খুলিয়া সামনে ধরে। পুরাতন বন্ধুর দল। ইহাদের ফেলিয়া সে এতকাল ঘুমন্ত পুরীতে কাল কাটাইল যে কি ভাবিয়া? এখানে কাজ আছে, আমোদ আছে, পয়সা রোজগার আছে, তারপর ইয়ে আছে। আর সে কোথাও

যাইবে না কলিকাতা ছাড়িয়া। মরিতে হয় এখানেই মরিবে।

পনেরো বিশ দিন এখানে ওখানে হাঁটাহাঁটি করিয়াও কিন্তু চাকুরী মিলিল না। বসু মহাশয় ঝাড়া জবাব দিলেন। এখন সুশ্রী চেহারার ছোকরা ক্যান্‌ভাসার—বেশ লম্বা জুলপি, ঘাড় বাহির করিয়া চুল ছাঁটা, লপেটা জুতা পায়ে, থিয়েটারের রামের মত গলা, এই সবাই চায়। বয়স হইয়া গেলে, মানে, এখন উঁহাদের লোক আছে, দরকার হইলে চিঠি লিখিয়া জানাইবেন পরে।

পুরোনো মেসেই উঠিয়াছিল, বারান্দাতে আছে। গোলাপীর সঙ্গে দেখা করে নাই। এখন করিতে চাহেও না সে। অনাহারে দু'দিন কাটিল মধ্যে। অবশেষে একদিন আহিরি-টোলার ঘাটেই গিয়া হাজির হইল, যদি হাতকাটা তেলওয়ালা সেই ছোকরার সঙ্গে দেখা হইয়া যায়। সে সাড়ে বারোটার স্টীমারে রোজ বালি হইতে আসে বলিয়াছিল। সাত আট দিন ক্রমাগত ঘুরিয়াও কিন্তু ছোকরার দেখা মিলিল না। কৃষ্ণলালের দুঃখ শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আর চলে না। আচ্ছা, সে ক্যান্‌ভাসারি ভুলিয়া যাইতেছে না তো? আজ কতদিন চাকুরী নাই। কতদিন বক্তৃতা দিবার অভ্যাস নাই। চর্চ্চা অভাবে শেষে কিনা ছোকরা ক্যান্‌ভাসারেরা তাহাকে—কৃষ্ণলালকে ছাড়াইয়া যাইবে!

সেদিন কৃষ্ণলাল নিজের টিনের ছোট সুটকেস্‌টি হাতে লইয়া ড্যালহাউসি স্কোয়ারের মোড়ে দাঁড়াইয়া হাত-পা নাড়িয়া ক্যান্‌ভাসারের বক্তৃতা জুড়িয়া দিল, চর্চ্চা রাখা দরকার তো বটেই, তাছাড়া সে নিজের শক্তি পরীক্ষা করিতে চায়, খরিদ্দার জোটে কিনা সে একবার দেখিবে। এখনও তাহার যাহা গলা আছে, থিয়েটারের রামের মত গলাওয়ালা কোন্ ছোকরা ক্যান্‌ভাসার তাহার সঙ্গে পাল্লা দিবে, সে দেখিতে চায়।—দত্তপুকুরের বাতের তেল! ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার বাত, বেদনা, মাথা ধরা, দাঁতশূলানি, হাত বেদনা, পিঠ বেদনা···ভদ্র-মহোদয়গণ। এই ঔষধটি আজ ত্রিশ বছর ধরিয়া এই লালদীঘির মোড়ে···

কৃষ্ণলাল মিনিট পাঁচ-ছয় পরে সগর্ব্বে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া লইল। বেশ ভিড় জমিয়া গিয়াছে। একজন ভিড় ঠেলিয়া কাছে আসিয়া বলিল—আমায় একটা ছোট ফাইল।—

কৃষ্ণলাল গম্ভীর ভাবে বলিল—আমার কাছে ওষুধ নেই—আমি বসু ইণ্ডিয়ান ড্রাগ সিণ্ডি-কেটের পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্টের লোক, যাঁদের দরকার হবে, তাঁরা একশো ছয়ের সি হরিধন পোদ্দারের লেনে বসু ইণ্ডিয়ান ড্রাগ সিণ্ডিকেটের অফিসে···আমার নামের এই স্লিপটা নিয়ে যান দয়া করে, টাকায় চার আনা কমিশন পাবেন—দাঁড়ান লিখে দিচ্ছি—

দিন পাঁচ-ছয় কাটিল। কৃষ্ণলালের নেশা লাগিয়া গিয়াছে। সে বেলা তিনটার সময় রোজ সুটকেস্ হাতে ঝুলাইয়া ড্যালহাউসি স্কোয়ারের মোড়ে গিয়া বক্তৃতা জুড়িয়া দেয়। আফিস ফেরতা লোকেরা ভিড় করিয়া শোনে।

সেদিন কৃষ্ণলাল দাঁড়াইয়া দত্তপুকুরের বাতের তেলের গুণ ব্যাখ্যা করিতেছে, এমন সময় একজন ভদ্রলোক ভিড় ঠেলিয়া একেবারে তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

কৃষ্ণলাল চমকিয়া উঠিল, বসু ব্রাদার্স সিণ্ডিকেটের মালিক নৃত্যগোপাল বসু মহাশয় স্বয়ং!

বসু মহাশয় কৃষ্ণলালের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, শুনুন একবার এদিকে—

কৃষ্ণলাল ভিড়ের পাশ কাটাইয়া কিছু দূরে বসু মহাশয়ের সঙ্গে গিয়া অপ্রতিভের মত দাঁড়াইল। বসু মহাশয় বলিলেন, এ কি হচ্চে?

কৃষ্ণলাল অপরাধীর মত মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল,—আজ্ঞে, আজ্ঞে, একবার চর্চ্চাটা রাখচি, নইলে—

বসু মহাশয় বলিলেন, তাই তো বলি এ কি কাণ্ড! গত দিন পাঁচ ছ'য়ের মধ্যে অফিসে আপনার নামের স্লিপ নিয়ে বোধ হয় একশো কি দেড়শো খদ্দের গিয়েছে। এত ওষুধ বিক্রি গত ক'মাসের মধ্যে হয়নি। একে তো এই ডাল্ সিজন্ যাচ্চে, আমি তো অবাক; সবাই বলে লালদীঘির মোড়ে আপনাদের পাবলিসিটি অফিসার, তাঁরই মুখে শুনে···আমি বলি আজ নিজে গিয়ে ব্যাপারটা কি দেখি তো নিজের চোখে। তা আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েচি, আপনার এরকম কাজে—

কৃষ্ণলাল বিনীতভাবে বলিল, আজ্ঞে, ভাবলাম ছোকরা ক্যানভাসারদের মত পিয়েটারী রামের গলা কোথায় পাবো—তবুও একবার দেখি দিকি—

বসু মহাশয় বলিলেন, শুনুন। ওসব থাক। আপনি আজই আপিসে আসুন একুনি। আপনাকে আজ থেকে হেড ক্যান্‌ভাসার য়্যাপয়েন্ট করলাম। ষাট টাকা মাইনে পাবেন আর কমিশন, শুধু তদারক ক'রে বেড়াবেন কে কেমন কাজ করচে, আর ছোকরাদের একটু তালিম দিয়ে দেবেন, বুঝলেন না? আসুন চ'লে আমার গাড়ীতে—

সন্ধ্যাবেলা।···নবীন কুণ্ডুর লেনে খোলার ঘরের সংকীর্ণ রোয়াকে গোলাপী ক্যানেস্তারা-কাটা তোলা উনুনে আঁচ দিয়া প্রাণপণে পাখার বাতাস করিতেছে, এমন সময় বাহিরে কে পরিচিত গলায় ডাকিল—গোলাপী ও গোলাপী, বাইরে এসে জিনিসগুলো ধরো দিকি। হাত ভেঙে গিয়েচে—

পারমিট

আজই সেই আশ্চর্য্য ব্যাপারটি আমার জীবনে ঘটেচে।

এমন সব অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ডও মানুষের জীবনে ঘটে যায়! বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এখনও ভাবলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়চি এক একবার।···

ভাদ্রের ভরা নদী। উভয় তীরের বনভূমির শাখা প্রশাখা জলের ওপর নত হয়ে আছে, এক এক জায়গায় জলমগ্ন নল-খাগ্‌ড়ার বন নদীর স্রোতোবেগে থরথর করে কাঁপচে। এমনি এক স্থানে জলের ওপর কলমি শাকের দাম দেখে নৌকোর মাঝি সয়ারাম শাক তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো নৌকা থামিয়ে! আমার সঙ্গী নকুড় চক্কত্তি তাকে বকচে—সন্ধে হবে,

ফিরতে বড্ড দেরি হয়ে যাবে শাক তুলতে।

নৌকো থেমে দাঁড়িয়ে জলের আবর্তে পাক খাচ্চে।

নকুড় চক্কত্তি বল্লে—একটা বিড়ি খাওয়া যাক, কি বলো হে?

আমার ওসব দিকে তত মন ছিল না। তবুও কলের পুতুলের মত ওর হাত থেকে বিড়ি নিয়ে ধরালুম। নকুড় চক্কত্তি জলের ধারের ধানগুলো সম্বন্ধে কি যেন বলচে। একবার সে বল্লে—যাক, একটা কাজের মত কাজ হয়েচে। ধানটা খুব জোর পাওয়া গিয়েচে। তুমি না গেলে হাকিম কি ধান দিত? হাকিমের স্ত্রী তোমায় চেনে নাকি? ও না থাকলে আজ ধান হ'ত, না ছাই হ'ত!

আমি অন্যমনস্কভাবে বল্লাম—হ্যাঁ।

গল্পে এমন ঘটনা অনেক পড়া গিয়েচে—কিন্তু বাস্তব জীবনে ক'টা ঘটে তাই ভাবচি। একটাও না, অথচ সন্দে পড়লে হয়তো মনে হবে, এমন গল্প অনেক পড়া গিয়েচে। জীবনের অলিখিত কাব্যে কত অধ্যায় কত ঘটনা—এর পাঠক কে, না যে সে জীবন যাপন করচে। বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান বিরাট জনতা উৎসুক শ্রোতা হতে পারে, দর্শক হতে পারে কিন্তু রসিক সমঝদার মাত্র, তার বেশি নয়।

বাগজোলার খালের মধ্যে দিয়ে জলের তোড় মাঠের দিক দিয়ে দু'ধারের ঘন বনের মধ্যে দিয়ে এসে নদীতে পড়চে। জলের তোড়ে একটা প্রকাণ্ড জগডুমুর গাছ শেকড় ছিঁড়ে জলে ঝুঁকে পড়ে আছে। নকুড় চক্কত্তি বল্লে—ছাখ তো বাবা সয়ারাম, গাছটাতে যদি কচি কচি ডুমুর পাওয়া যায়। নৌকোটা একটু থামিয়ে পাড় দিকি দু'টো—তরিতরকারির দাম, তবুও দু'টো ডুমুর নিয়ে গেলে কাজ হবে—ধানটা পেয়ে বড্ড সুবিধে হয়েছে—কি বলো রামলাল?

আমি বল্লাম—হ্যাঁ।

—তোমার আজ হয়েচে কি হে? কোনদিকে যেন মন নেই—

—যা হয়েচে তা হয়েচে, ধান পেয়েচ তো?

—ওঃ—দশ টাকায় এক মণ ধান, এ না পেলে তোমার আমার মত লোকের—

নকুড় চক্কত্তির কথাটা আমার মনে লাগলো বটে কিন্তু কথাটা সত্যি, আমাদের মত অবস্থার লোকের কি অবস্থা হ'ত আজ যদি সুবিধে দরের ধান পাওয়া না যেতো। অথচ আজ নকুড় চক্কত্তি নিজের নামের সঙ্গে আমার নামটা জড়ালে শুনে মনের মধ্যে খচ্ করে উঠলো কোথায়।

অনেকদিন আগের কথা। আমার পিসিমার বাড়ী বামুনহাটি থেকে ফিরে আসছিলাম। আমি কলেজ থেকে বেরিয়েচি চার পাঁচ বছর, কিন্তু তখনও কলকাতায় থাকি, ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকেই চিরকাল মন। এক মাড়োয়ারী ফার্ম্মে কাজ শিখি। এগারো মাইল রাস্তা মেঠো পথ। হেঁটে আসতে আসতে কাপাসীপাড়ার হাটতলায় বাঁধানো পুকুরের চাতালে বসে একটু বিশ্রাম করচি এমন সময় খুব ব্যস্তসমস্ত অবস্থায় দু'টি লোককে আমার

দিকে আসতে দেখে একটু আশ্চর্য্য হ'লাম।

লোক দু'টির মধ্যে একজন ভট্‌চাজ বামুন, মাথায় টিকি, ফর্সা রং, গায়ে সাদা উড়ুনি। অন্য লোকটি আঠারো উনিশ বছর বয়সের ছোকরা মাত্র। দু'জনেই খুব ঘর্মাক্ত, হাঁপাতে হাঁপাতে যেন অনেক দূর থেকে আসচে। ভট্‌চাজ মশায় আমার কাছে এসে বল্লেন—ওঃ ছুটতে ছুটতে এসে ধরেচি। পাওয়া গিয়েচে শেষকালে। তোমার পিসিমার বাড়ী গিয়ে শুনি তুমি আধ ঘণ্টা আগে বেরিয়েচ—তখুনি রমেশকে বল্লাম, পা চালা, রমেশ। ধরতেই হবে পথে।

আশ্চর্য্য হয়ে বল্লাম—ব্যাপার কি? আপনারা আমায় খুঁজচেন?

—হ্যাঁ, বাবাজী হ্যাঁ। দাঁড়াও একটু জিরিয়ে নিই আগে—

মনে মনে ভাবচি এমন তো কোথাও চুরি বা খুন করে পালাচ্চি নে, তবে এরা এমন ব্যস্তসমস্ত হয়ে আমার পেছনে ছোটে কেন? কিন্তু কিছু পরেই ভট্‌চাজ মশায় আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করলেন। আমায় বল্লেন—তোমায় এখুনি যেতে হবে বাবাজী। এই পাশেই গ্রাম, সীতানাথ বাবুর নাম শোনোনি? এ অঞ্চলের জমিদার। তোমার সঙ্গে তাঁর এক মেয়ের সম্বন্ধ আমিই প্রস্তাব করেচি। তুমি এসেচ খবর পেয়ে তোমার পিসিমার বাড়ী দৌড়েছিলাম। এটি আমার ভাইপো।—

এতক্ষণে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেল বটে, কিন্তু সবটা নয়। বল্লাম—কিন্তু আমি সেখানে যাবো কেন হঠাৎ?

—মেয়ে দেখতে, মেয়ে দেখতে। তাঁরাই পাঠিয়ে দিয়েছেন আমায়! সীতানাথ বাবু বল্লেন—নিয়ে এসো তাঁকে!

—তিনি কি করে জানলেন আমি পিসিমার বাড়ী গিয়েচি—

—তোমার যাবার দিন আমি তোমাকে দেখেছিলাম বাবাজী। সে দিন হাটে তোমার পিসেমশায়ের সঙ্গে দেখা, তিনি বল্লেন, তুমি ওখানেই আছ। আমি এসে সীতানাথ বাবুকে বলতেই তিনি বল্লেন, নিয়ে এসো, মেয়ে দেখে যান তিনি?

আমার মনের খট্‌কা গেল না। কোথাও কিছু ভুল হয়ে থাকবে হয়তো। আমি বিবাহ করার জন্যে অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠিনি। আমার পিসেমশায়ের বাড়ী দু'বছর পাঁচ বছর অন্তর একবার যাই, তিনিই বা কি করে জানলেন আমি বিয়ে করবো কি না।

হঠাৎ আমার মনে একটা তীব্র কৌতূহল হ'ল। এমন ভাবে রাস্তা থেকে ডেকে কেউ আমাকে কখনো মেয়ে দেখাতে নিয়ে যায় নি। সীতানাথ বাবু কেমন জমিদার, কেমন তাঁর মেয়ে, এ আমায় দেখতে হবে।

ওরা দু'জনে আমায় নিয়ে পাশের এক রাস্তা ধরলে। সে রাস্তার দু'ধারে ঘন বাঁশবন, কাপাসীপাড়ার খুস্তকার পাড়া ছাড়িয়ে একটা খুব বড় মাঠ, মাঠের মধ্যে অনেক দূরে কাদের একটা সাদা রংয়ের বাড়ী। ভট্‌চাজ মশায় বল্লেন—ওই হ'ল রায়েদের বাড়ী—এ অঞ্চলে নামডাক আছে ওদের। বংশও খুব ভালো—নাম শোনো নি?

আমিই বিনীত ভাবে বল্লাম, আমার এ অঞ্চলে তত বেশি যাতায়াত নেই। কাজেই অনেক লোকেরই নাম শুনি নি।

একটা সাবেক আমলের বড় বাড়ীর সামনে আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম। বাড়ীটা দেখেই বুঝলাম এক সময়ে এ বাড়ীর মালিকেরা দেশের জমিদার ও শাসক ছিল, যদিও এখন এদের সে অবস্থা নেই। থাকলে রাস্তা থেকে ডেকে এনে আমায় মেয়ে দেখাতো না।

একটি বেশ সুন্দর মত ছোকরা আমাদের ডাক শুনে বাইরে এলো, তারপর এলেন বাড়ীর কর্ত্তা স্বয়ং সীতানাথ রায়। আমাদের সাদরে নিয়ে গিয়ে বসালেন বৈঠকখানার মধ্যে। খুব বড় সাবেকী বৈঠকখানা, দেওয়ালে বড় বড় হরিণের শিং, ঝাড়লণ্ঠন টাঙানো, বড় বড় পুরোনো বিবর্ণ ছবি ভেতরে বাইরে ঝুলনো। বৈঠকখানার এক পাশের তক্তপোশের ওপর অনেকগুলি বাদ্যযন্ত্র—সেতার, তানপুরা, ডুগিতবলা ইত্যাদি। মনে হ'ল সেগুলো ব্যবহার করবার লোক আছে এ বাড়ীতে। বেশ যত্নে তদ্বিরে গুছিয়ে রাখা। এক কোণে আট দশ গাছা বস্ত্র হুইলের ছিপ। ভট্‌চাজ মশায় আমায় দেখিয়ে বল্লেন—এই ইনিই, এঁরই নাম রামলাল চাটুয্যে—

এমন কিছু বিখ্যাত লোক আমি নই, অথচ কথার ভাবে মনে হ'ল আমার সম্বন্ধে এঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই আলোচনা হয়েচে। সীতানাথ বাবু আমার দিকে চেয়ে বল্লেন—আপনার পিসেমশায় ভবশঙ্কর বাবুর সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয়। তিনি আমার সঙ্গে একবার আপনার কথা বলেছিলেন, তখন আপনি কোথায় পশ্চিমে চুনের ব্যবসা করতেন—খুব ব্যবসার ঝোঁক আপনার। এই তো চাই বাঙালীর। চাকরী চাকরী করে দেশ উচ্ছন্ন।

বিনীত ভাবে বল্লাম—চুনের ব্যবসা করি নে, করবার চেষ্টায় গিয়েছিলাম বটে।

—কোথায় যেন সেই?

—আজ্ঞে পশ্চিমে, বিন্ধ্যাচলের কাছে। ঘুটিং পাথর কিনে পুড়িয়ে চুন করে, সেখানে বড় বড় ভাঁটি আছে চুন পোড়ানোর।

—এখন কি করা হয় আপনার?

—বিজনেস করি কলকাতায় এক বন্ধুর সঙ্গে ভাগে। আমাকে 'আপনি' বলবেন না, আপনি পিশেমশায়ের বন্ধু, আমাকে—

—তা'তে কি তা'তে কি বাবাজী। ব্রাহ্মণসন্তান, কুলীনের সন্তান, সব নমস্য। কত বড় কুলীন বংশ আপনারা—

এইবার খানিকটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। সীতানাথ রায় মশায় পুরাতন-পন্থী লোক, এখনও কৌলিন্য মানেন, আমাদের কুলীন হিসেবে এক সময়ে বেশ নামডাক ছিল বাবা বলতেন। এখন আর ওসব কে মানে বা গ্রাহ্য করে? তবে এই সব অজ পাড়া-গাঁয়ে—

সীতানাথ রায় মশায়ের চেহারা আমার খুব ভালো লেগেচে। বেশ লম্বা, দোহারা,

ফর্সা চেহারা, মাথার চুল ধবধবে সাদা, মুখশ্রীতে একটা সদানন্দ, উদার অথচ একটু যেন নির্ব্বোধের ভাব। তা'তে মানুষকে আরও বেশি আকৃষ্ট করে তাঁর দিকে। আমি নিজে তো ধূর্ত্ত মানুষের চেয়ে নির্ব্বোধ লোক ঢের বেশি পছন্দ করি।

আমায় বল্লেন—আমার বড্ড আনন্দ হচ্চে আপনি আজ এসেচেন আমার বাড়ী—বিয়ে হোক না হোক, সে ভবিতব্য। কিন্তু আপনার আসাতেই—

গ্রামের দু'তিনটি ভদ্রলোক, কেউ কোঁচার টিক গায়ে, কেউ একটা আধময়লা পাঞ্জাবি গায়ে, এসে বৈঠকখানায় ঢুকে আমাদের দিকে চেয়ে নমস্কার করে বসলেন অন্যদিকে। রায় মশায় বল্লেন—ওদিকে কেন, সরে আসুন, সরে আসুন—এই ইনিই রামলাল বাবু—আলাপ পরিচয় করুন—

কিন্তু তাঁরা নিতান্ত গ্রাম্য লোক, আমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে তাদৃশ সাহস করলেন না বোধ হয়। একটু পরে তাঁদের একজন নিজেই তামাক সেজে টানতে লাগলেন। ভট্‌চাজ মশায়ও তামাক খাবেন বলে ওদিকে উঠে গেলেন। আমি আর রমেশ এদিকে বসে রইলাম। সীতানাথ রায় মশায় একটু পরে বাড়ীর ভেতর থেকে এসে বল্লেন—চলুন, একটু মিষ্টিমুখ করবেন।—অজ পাড়াগাঁয়ে এইটিই বলা রীতি। একটু শহর-ঘেঁষা জায়গা হ'লে বলতো চলুন, চা খাবেন।

বৈঠকখানা ছাড়িয়ে খুব বড় একটা হলঘর পার হয়ে ডাইনে বাঁয়ে দু'দিকেই বারান্দা-ওয়ালা কুঠুরির সারি। অনেকগুলি কুঠুরি, আট-দশটার কম নয়, তারপর আবার খোলা রোয়াক্, পূব পশ্চিমে লম্বা। তারপর চাতাল বাঁধানো উঠান পার হয়ে ওদিকের আর একটা বড় টানা ঢাকা বারান্দায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল। আমি চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম। প্রাচীন জমিদার-বাটী বটে। ভেতরটা আগাগোড়া চকমেলানো, খুব উঁচু কার্নিশ-যুক্ত ছাদ- তবে সেকেলে বাড়ী, ছোট ছোট দরজা জানালা।

বারান্দায় আট দশজন লোকের প্রচুর জলযোগের আয়োজন সজ্জিত ছিল। সীতানাথ রায় মহাশয়ের প্রৌঢ়া গৃহিণী সকলকে লুচি পরিবেষণ করলেন—কারণ এখানে বাইরের লোকের মধ্যে এক যা আমিই আছি, আর সবাই এই গ্রামেরই লোক। আমার মনে হ'ল তিনি লুচি পরিবেষণের ছলে আমায় দেখতে এসেচেন এবং বেশ একটু আগ্রহের সঙ্গেই আমার দিকে চেয়ে চেয়ে বার বার দেখচেন।

জলযোগান্তে রায়-মশায় আমায় পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। আমি পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম করতেই তিনি বল্লেন—এসো বাবা এসো—

মনে হ'ল ঠিক যেন নিজের মা।

আমায় আর একটি বর্ষীয়সী মহিলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন গৃহিণী নিজে। বল্লেন—বড় কুলীন বংশ, যদি এখন আমার মেয়ের শিবপূজোর জোর থাকে—তোমরা পাঁচজনে আশীর্ব্বাদ করো—

এঁরা আমার সঙ্গে যে অমায়িক, হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করলেন, শুধু এই সব পল্লীগ্রামেই তার

তুলনা মেলে। নিজে আমি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম এঁদের আত্মীয়তায়। জানালা দিয়ে চোখে পড়চে ওঁদের চকমেলানো ছাদের ওপর ঝুঁকে-পড়া নারিকেল বৃক্ষের কম্পমান শাখা-প্রশাখা।

একটু পরে বাইরের ঘরে মেয়ে দেখানো হ'ল।

মেয়ে সুন্দরী না হোক, বেশ দেখতে শুনতে। বড় ঘরের মেয়ে ব'লে বোধ হয় বটে। সীতানাথ রায় মশায় নিজে যত্ন ক'রে মেয়েকে গান বাজনা শিখিয়েচেন। বল্লেন—ভট্চাজ মশায়, বিনু আমার গান-বাজনা জানে, সেতার বাজাতে পারে—সেটা একটু শুনতে উনি যদি চান—

আমি সলজ্জমুখে চুপ করে রইলাম। ভট্চাজ মশায় বল্লেন—হ্যাঁ হ্যাঁ—বিনু দিদি, ধরো একবার সেতারটা—

মেয়েটি বেশ সপ্রতিভভাবে গিয়ে বৈঠকখানার ঢালা বিছানায় বসে সেতার বাজালে, সীতানাথ রায় মশায় নিজে তুগি-তবলা ধরলেন। আমি গান-বাজনা বিশেষ কিছু বুঝি নে, করি কয়লা আর চুনের আড়তদারি, তবুও মনে হ'ল মেয়েটি কাঁচা হাতে সেতার ধরে নি। সেতার নামিয়ে খানিক পরে যখন সে দুটি গান গাইলে, তখন মেয়েটির কণ্ঠস্বর আমার কাছে বেশ ভালোই লাগলো। তবে, ঐ যে বল্লুম, ও জিনিসের সমঝদার নই আমি।

সেই অপরাহ্নটি আমার জীবনের এক অদ্ভুত অপরাহ্ন বটে। দূর সম্পর্কের পিসিমার বাড়ী থেকে ফিরচি। থাকি কলকাতায়, যখন আসি বাড়ীতে কালেভদ্রে, তখন হাঁটাপথে এগারো-বারো মাইল পথ নানা ধরণের পাড়াগাঁ, বিল, বাঁওড়ের মধ্যে দিয়ে যাবার প্রলোভনেই পিসিমার বাড়ী যাই—বিশেষ কোনো আত্মীয়তার টানে নয়।

সেই পথে ফেরবার সময়ে এ যেন এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। কখনো শুনিনি যাদের নাম, তাদের বাড়ীতে এসে এমন অমায়িক ব্যবহার পাওয়া আমার কাছে সম্পূর্ণ অভিনব। এই প্রাচীন জমিদারবাড়ী, ওই ভাঙা পুজোর দালানের কার্নিশে বটচারাটা, জানালার বাইরে ওই গোলার সারি, এই সুগায়িকা মেয়েটি—সব যেন স্বপ্ন। আমি জানি এ বিয়ে হবে না, বিয়ে করার ইচ্ছে নেইও আমার, থাকলেও উপায় নেই—ব্যবসা-জীবনের সবে আমার শুরু, এখন বিয়ে ক'রে নিজেকে সংসার-জালে জড়িত করতে চাই নে আমি। তা ছাড়া ওঁরা অনেক কিছু ভুল খবর শুনেচেন আমার সম্বন্ধে, এটা ওঁদের কথাবার্ত্তা থেকে বুঝতে পারলাম। আমি সামান্যই ব্যবসা করি, তাও একটি বন্ধুর সঙ্গে ভাগে। সামান্য পুঁজির উপর ব্যবসা—এমন কিছু আয় হয় না যা'তে কলকাতা শহরে বাসা ক'রে পরিবার নিয়ে সচ্ছলভাবে থাকা যায়।

এমন সময় ভট্চাজ মশায় এমন একটি কথা বল্লেন যা'তে আমি একেবারে অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

তিনি বল্লেন—বাবাজীর নিজের বাড়ী আছে কলকাতায়, নিজেই করেচেন—

রায় মশায় বল্লেন—হ্যাঁ, সে তো আপনি বল্লেন সেদিন—

আমি অবাক। ভট্চাজ মশায় জেনে শুনে মিথ্যে কথা বলচেন ঘটকালি অগ্রসর করবার

জন্যে, না উনি আমার সম্বন্ধে ভুল খবর পেয়েছেন ?

আমি তখনি প্রতিবাদ করতাম কিন্তু হঠাৎ কেমন দুর্ব্বলতা এসে গেল মনে। ওই যে মেয়েটি এখানে বসে আছে, ওর কাছে এখুনি এত খেলো হব কেন ? বিয়ে হবে না জানি, মেয়েটি উঠে যাক—আমিও এখান থেকে চলে যাই—তারপর আমি যা করবো তা আমার জানাই আছে।

রায় মশায়ই বল্লেন—তা'হলে মেয়েটিকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যেতে পারি ?

অপরাধের বোঝা যথেষ্টই ভারী হয়েছে তাঁর কাছে আমার। আর নয়—আমি মেয়েকে নিয়ে যেতে বল্লাম। একটু পরে এল বাড়ীর মধ্যে থেকে মেয়ের হাতের নানারকম সূচের কাজকর্ম্ম—একটি রাশ। কত রকমের তুলোর কুকুর, পশমের আসন, রুমাল, টেবিল ঢাকা কাপড়, মাছের আঁশের হাঁস, ফ্রেম বাঁধানো—ইত্যাদি ! একটি সুদর্শন ছোট ছেলের সঙ্গে একজন ঝি সেগুলো নিয়ে এসে আমার সামনে রাখলে। গিন্নিমা নাকি সেগুলি পাঠিয়েছেন।

আরও আধ ঘণ্টা।

এইবার রওনা হতে হবে। ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। সীতানাথ রায় মশায় আমাকে প্রথমে কিছুতেই আসতে দেবেন না, রাত হয়ে আসচে—এখন তিনি আমায় ছেড়ে দিতে পারেন না। রাত্রে এখানেই থাকতে হবে।

আমি বল্লাম—কোন অসুবিধে হবে না, মঙ্গলগঞ্জের ঘাটে নৌকো ভাড়া ক'রে চলে যাবো। সে ঘাট তো মোটে দু'মাইল। জ্যোৎস্নারাত্রে বেশ চলে যাবো।

সীতানাথ রায় মশাই আমার সঙ্গে একাই খানিক দূর হেঁটে চললেন। বল্লেন—আপনাকে আর বেশি কি বলবো মেয়ে আমার বড্ড ভালো।

—আজ্ঞে নিশ্চয়ই।

—আপনার মতামতটা যদি জানতেন—

—সেটা আমার মামার সঙ্গে পরামর্শ করে আপনাকে জানাবো, কারণ মামাই বলতে গেলে এখন অভিভাবক—

বলা বাহুল্য, যে মাতুলকে কর্ম্মকর্ত্তা নির্দ্দেশ করলাম, তাঁর খবর পর্য্যন্ত রাখিনি আজ তিন চার বছর।

বল্লুম—তাহ'লে আপনি আর এগোবেন না—সন্ধে হয়ে এল—

স্থানটি নির্জ্জন। গ্রাম ছাড়িয়ে বড় একটা বিল ডান দিকে, সামনে ধূ ধূ মাঠের বুক চিরে সাদা বালির রাস্তা সোজা পশ্চিম দিকে চলে গিয়েচে। কেউ কোথাও নেই।

রায় মশায় এদিক ওদিক তাকিয়ে সুর নীচু করে বল্লেন—যা'তে এ হয়, তা তোমাকে করতেই হবে বাবাজী। আমার স্ত্রীর বড্ড পছন্দ হয়েচে তোমাকে, আমায় ডেকে বলছিল। আর কি জানো, বাইরে ঠাট যতই ভাখো, তেমন অবস্থা তো আর নেই। তোমার মত সুপাত্র কোথায় পাবো। দেনা পাওনার জন্য কিছু আটকাবে না—তোমায় কলকাতায় বাড়ী সাজানো আসবাবপত্তর দিতে পারব না হয়তো, তবে মেয়ের গা সাজানো গহনা

দেখো। ত্রিশ ভরি সোনা দেবো, ওর গর্ভধারিণীর যা আছে, তা দুই মেয়েকে তিনি ভাগ ক'রে দেবেন। তাহলে মনে থাকে যেন বাবাজী—

এই প্রথম তিনি আমায় ঘনিষ্ঠ সম্বোধন করলেন!

চলে এলাম সেদিন এবং কয়েকদিন পরে কলকাতাতেও এলাম। তারপর আমি কোন উচ্চবাচ্য করিনি এ বিষয়ে। সীতানাথ রায় মশায় পত্র দিয়েছিলেন, লোক পাঠিয়েছিলেন। বহু অনুরোধ করেছিলেন—শেষ পর্য্যন্ত যদি আমি বিবাহ করি, উৎকৃষ্ট ধানের জমি মেয়ের নামে লেখাপড়া করে দিতে চেয়েছিলেন,—প্রায় পনেরো বিঘে। বড়ই দুঃখের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে হ'ল আমায়। তিনি আগাগোড়া ভুলের ওপর যে বাড়ীর ভিৎ পত্তন করেছিলেন, সে ভিতের ওপর আমি বাড়ী তুলতে পারি নি।

সব কথা খুলে বলি নি কেন?

তখন বয়স ছিল কম। গর্ব্বে বাধে, মুখ ছোট হয়ে যায়। এখন হ'লে সব খুলে বলতাম, তখন তা পারি নি।

এখন দেশেই আছি। এই যুদ্ধের বাজারে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার চালানো বড়ই কষ্ট। ব্যবসা অনেকদিন নষ্ট হয়ে গিয়েচে—বন্ধুই হ'ক আর যে-ই হ'ক ভাগে ব্যবসা না করাই ভালো—এই অতি মূল্যবান অভিজ্ঞতা ক্রয় করতে হয়েচে অতি কষ্টে উপার্জ্জিত হাজার সাতেক টাকার বিনিময়ে।

সেদিন প্রভা বল্লে—সামনের মাসে ধান ফুরিয়ে যাবে। ছত্রিশ টাকা চালের মণ, কি ক'রে এই পুরীপাল্লা চালাবো। সস্তায় নাকি কন্‌ট্রোলের ধান দিচ্চে মহকুমায়—চেষ্টা দেখো না?

তাই আজ ক'দিন ধরে হাঁটাহাটি করছি মহকুমায়। ধান সস্তায় দেবার মালিক এক বড় অফিসার, তিনি কলকাতা থেকে এসে দিন পনেরো আছেন। তাঁর আরদালি ক'দিন ফিরিয়ে দিয়েচে।

আজ নকুড় চক্কত্তি বল্লে, এমনি না হয়—একজন উকিল ধরে হাকিমের কাছে দরখাস্ত দিতে হবে! রোজ হেঁটে আর পারিনে—

তাই দু'জনে মিলে একখানা নৌকো ভাড়া করে এসেছিলাম।

বেলা দশটার সময় হাকিমের বাসার ফটকে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে না, ভেতরে ঢুকতেও সাহস হয় না। এমন সময় হাকিমের ছোক্‌রা আরদালিকে আসতে দেখে তাকে বল্লাম—ওহে শোনো, আমাদের দরখাস্তখানা নিয়ে যাও না সাহেবের কাছে?

হাকিম বাঙালী হলেও তাঁকে সাহেব বলাই নিয়ম।

লোকটা ইতস্তত করচে দেখে নকুড় চক্কত্তি তাকে দু' আনা পয়সা দিয়ে বল্লে—পান

বিড়ি খেয়ো। আমরা গরীব লোক, নিয়ে যাও দরখাস্তখানা, আজ ন'দিন হাঁটাহাঁটি করচি। ধান মঞ্জুর হ'লে তোমায় আরো কিছু দেবো—

আরদালি কি ভেবে দরখাস্ত নিয়ে চলে গেল।

দু'ঘণ্টা কারো দেখা নেই—কেউ ডাকে না। সাহেব তো দূরের কথা, আরদালিরও চুলের টিকি আর দেখা যায় না। নকুড় চক্কত্তি বল্লে—কি ব্যাপার হে, দু'আনা পয়সাই গেল এ বাজারে—থাকলে তবুও ছেলেপিলের জন্য দু'খানা গজা টজা নিয়ে গেলে—

এমন সময় সেই ছোকরা আরদালি বারান্দায় বেরিয়ে বল্লে—রামলাল বাবু কার নাম?

নকুড় চক্কত্তি বল্লে—যাও হে, তোমায় ডাক পড়েচে—দেখে এসো—আমার কথাটাও একটু ব'লো। না খেয়ে মরে যাবে ছেলেপিলে—

বারান্দা পার হয়ে সামনের সাজানো মাঝারি গোছের ঘরে ঢুকেই আমি সামনে একটি মহিলাকে দেখে একেবারে চমকে গেলাম। থতমত খেয়ে সরে যাব কিনা ভাবচি, এমন সময়ে মেয়েটি হাত তুলে আমায় নমস্কার করলে। আমি আরও থতমত খেয়ে গেলাম।

হাতের একখানা কাগজ দেখিয়ে মেয়েটি বল্লে—এ দরখাস্ত আপনি করেচেন? আমি আপনার নাম দেখে বুঝেচি আর গ্রামের নাম দেখে—আমায় চিনতে পারলেন না?

নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে মেয়েটির দিকে ভালো ক'রে চাইলাম। কোথায় যেন দেখেচি, কিন্তু মনে করতে পারলাম না কোথায় দেখেচি।

মেয়েটি মৃদু হেসে বল্লে—আমাদের বাড়ী আপনি গিয়েছিলেন—আমার বাবার নাম শ্রীসীতানাথ রায়, কাপাসীপাড়া—

আমার সমস্ত শরীর যেন কাঠের মত আড়ষ্ট হয়ে গিয়েচে। এই সেই স্মৃতি, সীতানাথ রায়ের মেয়ে।

মেয়েটি আবার বল্লে—আমি আপনাকে আরও দুদিন দেখেচি। দেখেই চিনেছিলাম, একটু সন্দেহ ছিল—আজ দরখাস্তে আপনার নাম দেখে আর সন্দেহ রইল না। উনি একটু বিশ্রাম করচেন। আপনার দরখাস্ত ওঁকে ব'লে মঞ্জুর করিয়েচি—নিয়ে যান। চেহারা খারাপ হয়ে গিয়েচে আগেকার চেয়ে। একটু চা খাবেন?

আমি যেন সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে বল্লাম—না—না—এখন থাক্—

মেয়েটি হাত তুলে নমস্কার ক'রে বল্লে—এবার এখানে এলে কিন্তু আবার দেখা করবেন। ওঁকে বলেচি আমার বাপের বাড়ীর দেশে আপনার পিসিমার বাড়ী। অবিশ্যি আসবেন, চা খাবেন সেদিন—

আমি দরখাস্ত হাতে নিয়ে বার হয়ে এলাম। সস্তায় দু'মণ ধানের পারমিট পেয়েছি। স্ত্রী-পুত্র এখন দু'মাস খেয়ে বাঁচবে।

ওর ভাল নাম বোধ হয় ছিল নিস্তারিণী। ওর যৌবন বয়সে গ্রামের মধ্যে অমন সুন্দরী বৌ ব্রাহ্মণপাড়ার মধ্যেও ছিল না। ওরা জাতে যুগী, হরিনাথ ছিল স্বামীর নাম। ভদ্রলোকের পাড়ায় ডাকনাম ছিল, 'হ'রে যুগী'।

নিস্তারিণীর স্বামী হরি যুগীর গ্রামের উত্তর মাঠে কলাবাগান ছিল বড়। কাঁচকলা ও পাকাকলা হাটে বিক্রী ক'রে কিছু জমিয়ে নিয়ে ছোট একটা মনোহারি জিনিসের ব্যবসা করে। রেশমি চুড়ি ছ'গাছা এক পয়সা, দু'হাঁত কার এক পয়সা—ইত্যাদি। প্রসঙ্গক্রমে মনে হ'ল 'কার' মানে ফিতে বটে; কিন্তু 'কার' কি ভাষা? ইংরিজিতে এমন কোনো শব্দ নেই, হিন্দি বা উর্দ্দুতে নেই, অথচ 'কার' কথাটা ইংরিজি শব্দ বলে আমরা সকলেই ধরে নিয়ে থাকি! যাক্ সে। হরি যুগীর বাড়ীতে দুখানা বড় বড় মেটেঘর, একখানা রান্নাঘর, মাটির পাঁচিল-ঘেরা বাড়ী। অনেক পুষ্যি বাড়ীতে, দু'বেলা পনেরো-ষোলোখানা পাত পড়ে। হরি যুগীর মা, হরি যুগীর দু'টি ছোট ভাই, এক বিধবা ভাগ্নী, তার দুই ছেলেমেয়ে। সংসার ভালোই চলে, মোটা ভাত, কলাইয়ের ডাল ও ঝিঙে ও লাল ডাঁটাচচ্চড়ির অভাব কোনোদিন হয়নি, গোরুর দুধও ছিল চার পাঁচ সের। অবিশ্যি দুধের অর্দ্ধেকটা ব্রাহ্মণপাড়ায় যোগান দিয়ে তার বদলে টাকা আসতো।

গ্রামের মধ্যে সুন্দরী বৌ-ঝির কথা উঠলে সকলেই বলতো—হ'রে যুগীর বৌয়ের মত প্রায় দেখতে'। গ্রামের নারী-সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি ছিল নিস্তারিণী। গেরস্তঘরের বৌ স্নান ক'রে ভিজে কাপড়ে ঘড়া কাঁকে নিয়ে যখন সে গাঙের ঘাট থেকে ফিরতো, তখন তার উদ্দাম যৌবনের সৌন্দর্য্য অনেক প্রবীণের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিত।

এ গ্রামে একটা প্রবাদ আছে অনেকদিনের।

তুলসী দারোগা নদীর ঘাটের পথ ধরে নীলকুঠীর ওদিক থেকে ঘোড়া ক'রে ফিরবার সময়ে তুঁতবটের ছায়ায় প্রস্ফুট তুঁত ফুলের মাদকতায় সুবাসের মধ্যে এই সিক্তবসনা গৌরাঙ্গী বধূকে ঘড়া কাঁকে যেতে দেখল। বসন্তের শেষ, ঈষৎ গরম পড়েচে—নতুবা তুঁত ফুল সুবাস ছড়াবে কেন?

তুলসী দারোগা ছিল অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ জাঁহাবাজ দারোগা—'হয়'কে 'নয়' করবার এমন ওস্তাদ আর ছিল না। চরিত্র হিসেবেও নিষ্কলঙ্ক ছিল, এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই। তুলসী দারোগার নামে এ অঞ্চলে বাঘে গোরুতে একঘাটে জল খেত। তার সুনজরে একবার যিনি পড়বেন, তাঁর হঠাৎ উদ্ধারের উপায় ছিল না। এ হেন তুলসী দারোগা হঠাৎ উন্মনা হয়ে পড়লো সুন্দরী গ্রাম্যবধূকে নির্জ্জন নদীতীরের পথে দেখে। বধূটিকে সন্ধান করবার লোকও লাগলে। হরি যুগীকে দু'তিনবার থানায় যেতে হ'ল দারোগার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কিন্তু নিস্তারিণী ছিল অন্য চরিত্রের মেয়ে, শোনা যায় তুলসী দারোগার পাঠানো বৃন্দাবনী শাড়ী সে পা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে বলেছিল তাদের কলাবাগানের কল্যাণে অমন শাড়ী

সে অনেক পরতে পারবে ; জাতমান খুইয়ে বৃন্দাবনী কেন, বেনারসী পরবার শখও তার নেই।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে তুলসী দারোগা এখান থেকে বদলি হয়ে চলে যায়।

আর একজন লোক কিন্তু কথঞ্চিৎ সাফল্য লাভ করেছিল অন্যভাবে। গ্রামের প্রান্তে গোসাঁইপাড়া, গ্রামের মধ্যে তারা খুব অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, প্রায় জমিদার। বড় গোসাঁইয়ের ছেলে রতিকান্ত নদীর ধারে বন্দুক নিয়ে শিকার করতে গিয়েছিল—সন্ধ্যার প্রাক্কালে, শীতকাল। হঠাৎ সে দেখলে কাদের একটি বৌ ঘড়াসুদ্ধ পা পিছলে পড়ে গেল—খুব সম্ভব তাকে দেখে। রতিকান্ত কলকাতায় থাকতো, দেশের ঝি-বৌ সে চেনে না। সে ছুটে গিয়ে ঘড়াটা আগে হাঁটুর ওপর থেকে সরিয়ে নিলে, কিন্তু অপরিচিতা বধূর অঙ্গ স্পর্শ করলে না। একটু পরেই সে দেখলে বধূটি মাটি থেকে উঠতে পারছে না, বোধহয় হাঁটু মচকে গিয়ে থাকবে। নির্জন বনপথ, কেউ কোনদিকে নেই, সে একটু বিব্রত হয়ে পড়লো। কাছে দাঁড়িয়ে বল্লে—মা, উঠতে পারবে, না হাত ধরে তুলবো ?

তারপর সে অপরিচিতার অনুমতির অপেক্ষা না করেই তার কোমল হাতখানি ধরে বল্লে—ওঠ মা আমার ওপর ভর দিয়ে। কোন লজ্জা নেই—উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করো তো—

কুণ্ঠিতা সঙ্কুচিতা বধূ ছিল না নিস্তারিণী। সে ছিল যুগীপাড়ার বৌ—তাকে একা ঘাট থেকে জল আনতে হয়, ধান ভানতে হয়, ক্ষার কাচতে হয়—সংসারের কাজকর্মে সে অনলস, অক্লান্ত। যেমনি পরিশ্রম করতে পারে, তেমনি মুখরা, তেমনি সাহসিকাও বটে। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের গৌরবে তখন তার নবীন বয়সের নবীন চোখ দুটি জগৎকে অন্য দৃষ্টিতে দেখে।

সে উঠে দাঁড়ালো, রতিকান্তের সঙ্গে কিন্তু কোনো কথা বল্লে না। বুঝতে পারলে গোসাঁইপাড়ার বাবুদের ছেলে তার সাহায্যকারী। বাড়ী গিয়ে দু-তিন দিন পরে সে স্বামীকে দিয়ে একছড়া সুপক্ক চাঁপাকলা ও নিজের হাতের তৈরী বাঁশশলা ধানের খইয়ের মুড়কী পাঠিয়ে দিলে গোসাঁইবাড়ী। বল্লে—আমার ছেলেকে দিয়ে এসো গে—

নিস্তারিণী সেই থেকে সেই একদিনের দেখা সুদর্শন যুবকটিকে কত কি উপহার পাঠিয়ে দিত। রতিকান্তের সঙ্গে আর কিন্তু কোনদিন তার সাক্ষাৎ হয় নি। গোসাঁই-বাড়ীর ছেলে যুগী-বাড়ীতে কোনো প্রয়োজনে কোনদিন আসে নি।

রতিকান্ত কলকাতাতেই মারা গিয়েছিল অনেকদিন পরে। নিস্তারিণীর দুতিন-দিন ধরে চোখের জল থামেনি, এ সংবাদ যখন সে প্রথম শুনলে।

গ্রামের অবস্থা তখন ছিল অন্যরকম। সকলের বাড়ীতে গোলাভরা ধান, গোয়ালে দু-তিনটি গোরু থাকতো। সব জিনিস ছিল সস্তা। নিস্তারিণীদের বাড়ীর পশ্চিম উঠানে ছোট একটা ধানের গোলা। কোন কিছুর অভাব ছিল না ঘরে। বরং ব্রাহ্মণ-পাড়ার অনেককে সে সাহায্য করেছে।

একবার বড্ড বর্ষার দিনে সে বাড়ীর পিছনের আমতলায় ওল তুলচে—এমন সময় বাঁড়ুয্যেবাড়ীর মেয়ে ক্ষান্তমণি এসে বল্লে—

—ও যুগী-বৌ ?

নিস্তারিণী অবাক হয়ে মুখ তুলে চাইলে। বাঁড়ুয্যেবাড়ীর মেয়েরা কখনো তাদের বাড়ীর বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে কথা বলে না। সে বল্লে—কি দিদিমণি?

—একটা কথা বলবো।

—কি বলো দিদিমণি—

—আমাদের আজ একদম চাল নেই ঘরে। বাদলায় শুকুচ্চে না, কাল ধান ভেজে দুটো চিঁড়ে হয়েছিল। তোমাদের ঘরে চাল আছে, কাঠাখানেক দেবে?

নিস্তারিণী এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে, তার খাণ্ডার শাশুড়ী কোনোদিকে আছে কি না। পরে বল্লে—দাঁড়াও দিদিমণি—দেবানি চাল ঘরে আছে। শাশুড়ীকে লুকিয়ে দিতি হবে—দেখতি পেলে বড্ড বকবে আমারে। তা বকুক গে, তা ব'লে বামুনের মেয়েকে বাড়ী থেকে ফিরিয়ে দেবো?

আর একবার বাঁড়ুয্যেবাড়ীর বৌ তার বৃদ্ধা শাশুড়ীকে ঝগড়া করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল; সে বৌ ছিল গ্রামের মধ্যে নামডাকওয়ালা খাণ্ডার বৌ—শাশুড়ীর সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া বাধাতো, কেরোসিনের টেমি ধরিয়ে শাশুড়ীর মুখ পুড়িয়ে দিয়েছিল। পাড়ার কেউ ভয়ে বৃদ্ধাকে স্থান দিতে পারে নি, যে আশ্রয় দেবে তাকেই বড় বৌয়ের গালাগালি খেতে হবে। যুগী-বৌ দেখলে বাঁড়ুয্যেবাড়ীর বেড়ার কাছে বড় সেগুনতলার ছায়ায় ন'ঠাকরুণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে হাপুস নয়নে কাঁদচেন। গিয়ে বল্লে—ন'ঠাকরুণ, আসুন আমাদের বাড়ীর দাওয়াতে বসবেন—বড় বৌ বকেছে বুঝি?

ন'ঠাকরুণ শুচিবেয়ে মানুষ, তা ছাড়া বাঁড়ুয্যেবাড়ীর গিন্নী হয়ে যুগী বাড়ী আশ্রয় নিলে মান থাকে না। সুতরাং প্রথমে তিনি বল্লেন—না বৌ, তুমি যাও, আমার কপালে এ যখন চিরদিনের, তখন তুমি একদিন বাড়িতে ঠাঁই দিয়ে আমার কি করবে? নগের বৌ যেদিন চটকাতলায় চিতেয় শোবে, সেদিনটি ছাড়া আমার শান্তি হবে না মা। ওই 'কালনাগিনী' যেদিন আমার নগের ঘাড়ে চেপেচে—

নিস্তারিণী ভয়ে ভয়ে বল্লে—চুপ করুন ন'গিন্নী, বৌ শুনতি পেলি আমার এন্তক রক্ষে রাখবে না। আসুন আপনি আমার বাড়ীতে। এইখানে দাঁড়িয়ে কষ্ট পাবেন কেন মিথ্যে—

ন'গিন্নীকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে সে নিজের হাতে তার পা ধুয়ে দিয়ে পিঁড়ি পেতে দাওয়ায় বসালে। কিছু খেতে দেওয়ার খুব ইচ্ছে থাকলেও সে বুঝলে বড় ঘরের গিন্নী ন'ঠাকরুণ এ বাড়ীতে কোনো কিছু খাবে না, খেতে বলাও ঠিক হবে না। সে ভাগ্য সে করে নি।

অনেক রাত্রে গিন্নির বড় ছেলে নগেন খুঁজতে খুঁজতে এসে যখন মায়ের হাত ধরে নিয়ে গেল, তখন নিস্তারিণী অনেক অনুনয় বিনয় ক'রে বড় একছড়া মর্তমান কলা তাঁকে দিয়ে বল্লে—নিয়ে যান দয়া ক'রে। আর তো কিছু নেই, কলাবাগান আছে, কলা ছাড়া মানুষকে হাতে ক'রে আর কিছু দিতে পারিনে—

তার স্বামী সেবার রামসাগরের চড়কের মেলায় মনোহারী জিনিস বিক্রী করতে গেল। যাবার সময় নিস্তারিণী বল্লে—ওগো আমার জন্যি কি আনবা।

—কি নেবা বলো? ফুলন শাড়ী আনবো?

—না শোনো, ওসব না। একরকম আলতা উঠেচে আজ মজুমদার বাড়ী দেখে এলাম। কলকেতা থেকে এনেচে মজুমদার মশায়ের ছেলে—শিশিনিতে থাকে। কি একটা নাম বল্লে ভুলে গিইচি।

—শিশিনিতে থাকে?

—হ্যাঁ গো। সে বড় মজা, কাটির আগায় তুলো দেওয়া, তাতে করে মাখাতে হয়। ভালো কথা, তরল আলতা—তরল আলতা—

—কত দাম?

—দশ পয়সা। হ্যাগা, আনবে এক শিশিনি আমার জন্যি?

—ছাখবো এখন। গোটা পাঁচেক টাকা যদি খেয়ে দেয়ে মুনফা রাখতি পারি, তবে এক শিশিনি ঐ যে কি আলতা তোর জন্যি ঠিক এনে দেবো।

এইভাবে গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ার সাথে টেক্কা দিয়ে নিস্তারিণী প্রসাধন দ্রব্য ক্রয় করেছে। তাদের পাড়ার মধ্যে সে-ই সর্ব্বপ্রথম তরল আলতা পায়ে দেয়। শূদ্রপাড়ার মধ্যে ও জিনিস একেবারে নতুন—কখনো কেউ দেখেনি। আলতা পরবার সময়ে যে দেখতো সে-ই অবাক হয়ে থাকতো। হাজরী বুড়ী মাছ বেচতে এসেচে একদিন—সে অবাক হয়ে বল্লে—হ্যাঁ বড় বৌ, ও শিশিনিতে কি? কি মাখাচ্চ পায়ে?

নিস্তারিণী সুন্দর রাঙা পা দুখানি ছড়িয়ে আলতা পরতে বসেছিল, একগাল হেসে বল্লে—এ আলতা দিদিমা। এরে বলে তরল আলতা।

—ওমা, পাতা আলতাই তো দেখে এসেচি চিরকাল। শিশিনিতে আলতা থাকে, কখনো শুনিনি। কালে কালে কতই ছাখলাম। কিন্তু বড় চমৎকার মানিয়েছে তোমার পায়ে বৌ—এমনি টুকটুকে রং, যেন জগদ্ধাত্রী পিরতিমের মত দেখাচ্চে—.

এ সব ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা।

শীতের সকালবেলা। ওদের বড় ঘরের দাওয়ায় ছেঁড়া মাদুরে ছেঁড়া কাঁথা গায়ে নিস্তারিণী শুয়ে আছে। সংসারের সাবেক অবস্থা আর নেই, হরি যুগী বহুদিন মারা গিয়েচে—হরি যুগীর একমাত্র ছেলে সাধনও আজ তিন চার বছর একদিনের জ্বরে হঠাৎ মারা গিয়েচে। সুতরাং নিস্তারিণী এখন স্বামীপুত্রহীনা বিধবা। তার শাশুড়ী এখনও বেঁচে আছে, আর আছে এক বিধবা জা, জায়ের এক মেয়ে, এক ছেলে।

পঁয়ত্রিশ বছর আগের সে উচ্ছলযৌবনা সুন্দরী গ্রাম্য বধূটিকে আজ আর রোগগ্রস্তা, শীর্ণকায়া, মলিনবসনা প্রৌঢ়ার মধ্যে খুঁজেও পাওয়া যাবে না! হরি যুগীর মৃত্যুর সঙ্গে তাদের সে গোয়ালভরা গোরু ও গোলাভরা ধান অন্তর্হিত হয়েচে—ঘরের চালে খড় নেই, তিন চার

জায়গায় খুঁচি দেওয়া খসে-পড়া চালে বর্ষার জল আটকায় না। গত বর্ষার চালের ওপর উচ্ছেলতা গজিয়ে একদিকে ঢেকে রেখেচে, মাটির দাওয়ার খানিকটা ভেঙে পড়েচে, পয়সার অভাবে সারানো হয়নি। কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলে। সংসারের কর্ত্তা, যার আয়ে সংসারের শ্রী, সে চলে যাওয়ায় নিস্তারিণীর আদর এ বাড়ীতে আর নেই। আগে ছিল সে-ই সংসারের কর্ত্রী, এখন তাকে পরের হাত-তোলা খেয়ে থাকতে হয়—তার ছেলে সাধন বাপের মনোহারী দোকান আর কলাবাগান কোনো রকমে বজায় রেখেছিল।

তিন বছর আগের এক ভাদ্র মাসে খুব বৃষ্টির পরে সাধন নদীর ধারে কলাবাগানে কাজ করতে গিয়ে সেখানে মারা যায়। কেন মারা যায় তার কারণ কিছু জানা যায়নি। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সাধন ফিরলো না দেখে তার ঠাকুরমা নাতিকে খুঁজতে বার হচ্চে এমন সময় বেলেডাঙার দুজন মুসলমান পথিক এসে খবর দিলে—সাধন মুখ গুঁজড়ে কলাবাগানের ধারের পথে কাদার ওপরে পড়ে আছে—দেহে বোধ হয় প্রাণ নেই।

সকলে ছুটতে ছুটতে গেল। গ্রামের লোক ভেঙে পড়লো। সকলে গিয়ে দেখলে সাধন সত্যিই উপুড় হয়ে কাদার ওপর পড়ে, সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাখা, তার ওপর দিয়ে এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গিয়েচে। যেখানে শুয়ে আছে সেখানটা রক্ত প'ড়ে অনেকখানি জায়গা রাঙা, খানিকটা বৃষ্টির জলে ধুয়েও গিয়েচে। রক্তটা পড়েচে সাধনের মুখ থেকে।

গরীবের ঘরের ব্যাপার, দু দিনই মিটে গেল। সংসারের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়লো, ক্রমে—বাড়ীতে উপার্জ্জনক্ষম পুরুষ মানুষের মধ্যে বাকী কেবল হরি যুগীর ভাই যুগলের ছেলে বলাই। যুগলও বছদিন পরলোকগত, দাদার মৃত্যুর পর-বৎসরেই সে বিধবা স্ত্রী ও দু'বছরের শিশুপুত্রকে রেখে মারা যায়। বলাই এখন ষোলো বছরের, বেশ কর্ম্মঠ, স্বাস্থ্যবান বালক।

নিস্তারিণীকে এখন আদর করে 'নিস্তার' বা 'বড়বৌ' বলে কেউ ডাকে না—যে ডাকতো সে নেই। এখন তার নাম 'সাধনের মা'। কেউ ডাকে পিন্টুর ঠাম্মা। পিন্টু সাধনের শিশুপুত্র—এখন তার তিন বছর বয়েস। সাধনের বিধবা বৌয়ের বয়স এই সবে সতেরো।

নিস্তারিণী ডাক দিল—ও পিনটু, পিনটু—

পিনটু উঠানের আমতলায় খেলা করছিল, কাছে এসে বল্লে—কি ঠাকুমা?

—তোর মাকে একবার ডেকে দে—

পিনটুর ডাকে তার মা এসে দাওয়ার ধারে দাঁড়িয়ে বল্লে—কি হয়েচে, ডাকচো কেন?

—আমি আজ দুটো ভাত খাবো, বল্ তোর ঠাকুরমাকে—

পুত্রবধূ ঝঙ্কার দিয়ে বল্লে—ভাত বল্লিই অমনি ভাত, খাবা কোথা থেকে? সে আমি বলতে পারবো না ঠাকুরমাকে।

—তবে একগাল খই কি চিঁড়েভাজা যা হয় দে এখন—খিদেয় মলাম—

—হ্যাঁ, আমি তোমার জন্যি বামুনপাড়ায় বেরুই লোকের দোর দোর। অসুখ হয়েচে চুপ ক'রে শুয়ে থাকো বাপু।

ওরা ওই রকম। সাধনের বৌ মুখঝঙ্কার দেয়, তাকে একেবারেই মানে না। সেকালের আর একালের মেয়েতে কি তফাৎ, তাই সে ভাবে এক এক সময়ে। তারও একদিন সতেরো বছর বয়স ছিল, কখনো শাশুড়ীর একটা কথায় অবাধ্য হতে সাহস হ'ত তার? আশ্চর্য।

একটু পরে নিস্তারিণীর শাশুড়ী এসে দূরে দাঁড়িয়ে বল্লে—বলি, হ্যাঁ বৌ, তোমার আক্কেলখানা কি? আজ নাকি ভাত খেতে চেয়েচ? জ্বর রয়েচে চব্বিশ পহরের জন্তি। ভাত খেলেই হল অমনি?···বলি, সোয়ামী খেয়েচ পুত্তুর খেয়েচ, দেওর খেয়েচ—এখনো খাওয়ার সাধ মেটেনি তোমার?

নিস্তারিণী বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েচে অসুখে—তবু সে বল্লে, সোয়ামি পুত্তুর তো তুমিও খেয়েছিলে, তবুও তিন পাথর ক'রে ভাত মারো তো তিনটি বেলা। লজ্জা করে না বলতি?

নিস্তারিণীর শাশুড়ী এ'কথার উত্তরে চীৎকার ক'রে গালাগালি দিয়ে এক কাণ্ডই বাধালে। সাধনের বউকে ডেকে ব'লে দিলে—ওকে কিছু খেতে দিবিনে আজ ব'লে দিচ্চি। এ সংসারে যে খাটবে, সে খাবে। আমরা সবাই মায়ে ঝিয়ে খাটি, ও শুধু শুয়ে থাকে। রোগ নিয়ে শুয়ে থাকলি এ সংসারে চলে না। তার ওপর আবার যে সে রোগ নয়, ওকে বলে পাণ্ডুর রোগ। মুখ হলদে, চোখ হলদে, হাত পা ফুলেচে, ও কি সহজ রোগ? ও আর উঠবেও না, খাটবেও না, কেবল শুয়ে শুয়ে পাথর পাথর খাবে।

নিস্তারিণী বল্লে—খাবো—খাবো, বেশ করবো। আমার খোকা কলাবাগান সামলে রাখতো, তারই আয়ে বাড়ীসুদ্ধু খাওনি? সেই কলাবাগান তদ্বির করতে গিয়েই বাছা আমার চলে গেল। তোমরা ওদের বাপছেলের রক্ত জল করা কলাবাগান, মনিহারি ব্যবসা ঘোচালে। এখন আমায় বসিয়ে খেতে দেবে না তো কি করবে? নিশ্চয়ই দিতে হবে।

—বাসি আখার ছাই খেয়ো দেবো। ডাইনি রাক্কুসি—আমার সংসার তোর দিষ্টিতে জলে পুড়ে গেল—নইলে কি না ছেল, গোলাভরা ধান ছেল না? হাঁড়ি ভর্ত্তি ডালডুল, গোয়াল ভর্ত্তি গোরু ছাগল—ছেল না কি?

উভয় পক্ষের চেঁচামেচি শুনে ওর জা নির্ম্মলা সেখানে এসে পড়লো। এটি হরি যুগীর ছোট ভাই যুগলের বিধবা স্ত্রী। এর একমাত্র পুত্র বলাই এই সংসারের একমাত্র উপার্জ্জনক্ষম পুরুষ মানুষ। বলাইয়ের বয়েস এই উনিশ বছর।

বলাই বাঁশ কিনে গাড়ী বোঝাই দিয়ে রেলস্টেশনে নিয়ে যায়, সেখান থেকে মালগাড়ীতে উঠিয়ে কলিকাতায় পাঠায়। গত বছরখানেক এ ব্যবসা ক'রে সে গোটা পঞ্চাশ টাকা হাতে জমিয়েচে—মার হাতেই এনে দিয়েচে সে টাকা। নির্ম্মলা আবার সে টাকাটা থেকে কুড়িটি টাকা শাশুড়ীকে দিয়েচে। বুড়ী সেই টাকায় পাশের গ্রাম থেকে দুধ কিনে এ গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ায় যোগান দেয়, তাতেও সামান্য কিছু লাভ থাকে। বুড়ীর বয়স সত্তর ছাড়িয়ে গেলেও সে এখনও দুপুর রোদে সারা পাড়া, সারা গ্রাম ঘুরে বেড়ায়—

দূর দূরান্তরের চাষাগাঁয়ে হাঁসের ডিম, মুরগীর ডিম সংগ্রহ করতে যায় ব্রাহ্মণপাড়ায় বিক্রির জন্যে।

নির্মলা নিজেও বসে থাকে না, তিনু গাঙ্গুলীর বাড়ী ঝিয়ের কাজ ক'রে মাসে দু'টাকা মাইনে পায়!

সুতরাং এ সংসারে এখন নির্মলার প্রতিপত্তিই বেশি। নিস্তারিণীর দিন সকল রকমেই চলে গিয়েচে। এখন নির্মলার ছেলে বলাই পয়সা আনে, নির্মলা নিজে পয়সা আনে, বলাইয়ের পয়সায় ওর ঠাকুরমা দুধের যোগান দিয়ে কিছু আয় করে। নিস্তারিণী শীর্ণ পাণ্ডুর দেহে উত্থানশক্তিরহিত শয্যাগত অবস্থায় শুধু 'খাই খাই' করে রোগের দুষ্টক্ষুধায় অবোধ বালিকার মত। হরি যুগী বেঁচে থাকলে তার সে অন্যায় আবদার খাটতো, সাধন বেঁচে থাকলেও খাটতো। আজ তার আবদার কান পেতে শোনবার লোক কে আছে এ সংসারে।

নির্মলার বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ—বেশ ধপধপে ফর্সা, কৃশাঙ্গী, মুখচোখ ভালোই, মাথায় এখনো একঢাল চুল, চুলে একটিও পাক ধরে নি। যুগীদের মেয়েরা সাধারণত সুন্দরী হয়ে থাকে—নির্মলার মেয়ে তারা বেশ সুন্দরী। তারা বলাইয়ের ছোটো, এই মাত্র চোদ্দ বছর বয়েস। আজ বছর দুই হ'ল এই গ্রামেই তার বিয়ে হয়েচে।

নির্মলা এসে বল্লে—দিদি, চেঁচিও না। ঝগড়া করে মরচো কেন?

নিস্তারিণী কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—ছাক দিকি ছোট বৌ, আমায় কিনা রাক্ষুসি, ডাইনি বলে। আমি নাকি এসে ওনার সংসারে আগুন নাগিয়ে দিইচি। আমার সোয়ামী পুত্তুরের অন্ন উনি কোনো দিন বুঝি দাঁতে কাটেন নি—

নির্মলা বল্লে—সে তো তুমিও ওনাকে বলেচো। যাক্, এখন চুপটি ক'রে শুয়ে থাকো।

—ও ছোট বৌ, আমি দুটো ভাত—

—না, আজ না। তোমার গা ফুলেচে, মুখ ফুলেচে—তুমি ভাত খাবে কি ব'লে আজ?

—তা হোক, তোর পায়ে পড়ি—

—আচ্ছা এখন চুপ করো, বেলা হোক! ভাত রান্না হোক, আমি বলবো তখন।

নিস্তারিণীর হাত, পা, মুখ ফুলেচে একথা ঠিকই। বিশ্রী চেহারা হয়ে গিয়েচে একথা ঠিকই। কি বিশ্রী চেহারা হয়ে গিয়েচে তার, ওর দিকে যেন আর তাকানো যায় না—এমন খারাপ দেখতে হয়েচে ও। যত্ন করবার কেউ না থাকাতে আরও দিন দিন ওর অবস্থা খারাপতর হয়ে উঠেচে। খেতে ইচ্ছে করে কিন্তু আগ্রহ ক'রে খেতে দেবার কেউ নেই। রোগীর পথ্য তো দূরের কথা, দুটি ভাত তাই কেউ দেয় না।

ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে বেলা দশটা আন্দাজ সময়ে সে নাতিকে ডেকে চুপি চুপি বল্লে—পিনটু, দুটো পেয়ারা আনতে পারিস?

পিনটুর মা ছেলেকে বলে—খবরদার, যাবি নি বুড়ীর কাছে। ওর পাণ্ডুর রোগ হয়েচে, ছোঁয়াচে রোগ। ছেলে খেয়ে বসে আছে ডাইনি, আবার নাতিকে খাবার যোগাড় করচে।

ঠ্যাঙ ভেঙে দেবো যদি ওর কাছে যাবি—

বেলা দুপুরের পরে সে ভীষণ জ্বরে বিকেল পর্য্যন্ত অঘোরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইল—কখন যে এ বাড়ীর লোকে খাওয়া দাওয়া করেচে তা সে কিছুই জানে না। যখন তার খানিকটা জ্ঞান হ'ল, তখন ভাদ্র মাসের রোদ প্রায় রাঙা হয়ে উঠোনের আম গাছটা, বাঁশ-ঝাড়গুলোর আগায় উঠে গিয়েচে। মুখের কাঁথাটা খুলে দিয়েই ও চিঁ চিঁ ক'রে প্রথমেই ডাকলে—ও পিনটু, পিনটু—

পিনটু কোথা থেকে ছুটে এসে বল্লে—কি ঠামা?

—আমার জন্যি সেই পেয়ারা এনেলি?

—না ঠামা।

—আনিস্ নি? ছেলেমানুষ ভুলে গিয়েচিস। বোস এখানে।

কিন্তু পিনটু বসতে ভরসা পায় না, মা দেখতে পেলে মার খেতে হবে। সে আনমনে খেলা করতে করতে অন্যদিকে চলে গেল। একটু পরে নিস্তারিণী আবার ডাকলে—ও ছোট বৌ—ছোট বৌ—

কেউ উত্তর দিল না, কারণ এ সময়ে বাড়ীতে কেউ থাকে না।

আরও দু'বার ডাক দিয়ে নিস্তারিণী অবসন্ন হয়ে পড়লো, তার বেশি চেঁচামেচি করবার ক্ষমতা নেই।

বেশ খানিকক্ষণ পরে নির্ম্মলার মেয়ে তারা এসে বল্লে—হ্যাঁ জ্যাঠাইমা ডাকছিলে?

নিস্তারিণী চিঁ চিঁ করতে করতে বল্লে—কাত্‌রে কাত্‌রে মরে গেলাম। তা যদি তোমাদের একজনও উত্তর দেবে। একজন এমন রুগী বাড়ীতে রয়েচে—বোস এখানে একটু—

তারা ওর মায়ের মত ছিপছিপে গড়নের সুন্দরী বালিকা। নতুন বিয়ের কনে, পাশেই শ্বশুরবাড়ী। নবীন যুগীর ছেলে অভিলাষ তার স্বামী। এই মাত্র শ্বশুরবাড়ী থেকেই আসছে। আসবার কারণ অন্য কিছু নয়। অভিলাষ এখুনি গরম মুড়কি মেখেচে, বালিকা স্ত্রীকে আদর করে বলেচে, তোদের বাড়ী থেকে ধামি নিয়ে আয় মুড়কি খেতে দেবো। এই জন্যেই তার আগমন। রোগগ্রস্ত জ্যাঠাইমা বুড়ীর বকুমি শুনবার জন্যে সে এখন এখানে বসতে আসেনি। সুতরাং সে বিব্রত মুখে বল্লে—ও জ্যাঠাইমা, আমি এখন বসতে পারবো না, তোমার জামাই মুড়কি মেখেচে, নিয়ে বেলেডাঙায় ফিরি করতে বেরুবে—

—তোর মা কোথায়?

—বাড়ীতে কেউ নেই। মা গাঙ্গুলী বাড়ী কাজ করতে গিয়েছে, ঠাকুমা নরহরিপুরে হাঁসের ডিম আনতে গিয়েচে—

—পিনটুর মা কোথায়?

—ঐ যে শিউলীতলায় বসে বাসন মাজচে—

—একটু ডেকে দিয়ে যা দিকি মা—

পরে সুর খুবই নীচু ক'রে বল্লে—মা দুটো মুড়কি অভিলাষের কাছ থেকে নিয়ে আয় না?

আমার নাম যেন করিস নে—

তারা বল্লে—সে আমি পারবো না। অসুখ গায়ে মুড়কি খাবে কি? তারপর শেষকালে ঠাকুমা টের পেলে আমায় বকে ভূত ঝাড়াবে। চল্লাম আমি—ও বৌদিদি, শুনে যাও জেঠিমা ডাকচে—

পুত্রবধূ বিরক্ত মুখে এসে দূরে উঠোনে দাঁড়িয়ে বল্লে—বলি ডাকের ওপর ডাক কেন অত? আমার সংসারে কাজকর্ম নেই, না তোমার কাছে বসে থাকলে চলবে? কি বলচো বলো—

নিস্তারিণী কাতরস্বরে বল্লে—তা রাগ করিস নে আমার ওপর বৌমা। আমায় দুটো ভাত দে—

—দিই। জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছ, ভাত না খেলে কি চলে!

—তবে আমি কি খাবো, খিদে পায় না?

—আমি জানিনে। আদিখ্যেতার কথা শোনো। খিদে পায় তা আমি কি করবো? ঠাকুমা এলে বলো। ঠাকুমা না বল্লি আমি ভাত দিতি পারবো না।

—পিনটু কোথায়? একটু ডেকে দে আমার কাছে—বড্ড ইচ্ছে করে দেখতি—

পুত্রবধূ ঝঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠলো—অত সোহাগে আর কাজ নেই। ছেলের মাথা খেয়ে বসে আছে, এখন নাতিটি বাকি?

নিস্তারিণী মিনতির সুরে বল্লে—অমন ক'রে বলতি নেই, বৌমা। তা দে ডেকে, কিছু হবে না, দে একবার ডেকে—

পুত্রবধূ হাত পা নেড়ে বল্লে—না—না—হবে না। তোমার পাণ্ডুর রোগ হয়েচে, বিশ্রী ছোঁয়াচে রোগ। আমি ছেলে পাঠাতি পারবো না তোমার কাছে। গেলি আমারি যাবে—তোমার কি?

কথা শেষ ক'রেই মুখ ঘুরিয়ে পুত্রবধূ চলে গেল। নিস্তারিণীর দুই চোখ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল গড়িয়ে পড়ে' ছেঁড়া, ময়লা, তেলচিটে বালিশটা ভিজিয়ে দিলে। এমন কথাও লোককে লোকে বলে—তাও নিজের পুত্রবধূ। সাধনের নাম রেখেচে ওই ধুলোগুঁড়োটুকু—ওই অবোধ শিশু। মা সাতভেয়ে কালী, তার মঙ্গল করুন, মঙ্গল করুন।—সে না তার ঠাকুর-মা? বৌমা বলে কিনা, গেলে তারই যাবে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে নির্ম্মলা বামুনবাড়ীর কাজকর্ম্ম সেরে ফিরে এল। বড় জায়ের কাছে গিয়ে বল্লে—কেমন আছ দিদি? দেখি, গা দেখি—

নিস্তারিণী না ঘুম না জ্বরে আচ্ছন্নমত হয়ে পড়ে ছিল, কপালে ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ পেয়ে জেগে উঠে বল্লে—কে? ছোট বৌ? তুই আবার আমায় ছুঁলি কেন, তোর পাছে পাণ্ডুর রোগ হয়—আজ আমায় বৌমা বলেছে—হ্যাঁ, ছোট বৌ সাধনের ছেলে আমার কেউ নয়? বুলো তুমি—

নিস্তারিণী নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো। নির্ম্মলা বল্লে—চুপ করো চুপ করো দিদি, সবই

তোমার কপাল। পিরতিমের মত বৌ ছিলে, সব তো দেখেচি। স্বভাব-চরিত্তির সম্বন্ধে কেউ একটা কথা বলতি পারে নি কোনো দিন।

—কেন, দেওরদের কোলেপিঠে করে মানুষ করি নি? আমি যখন ঘর করতি এলাম, তোর সোয়ামী তখন ন' বছরের ছেলে। আমার পাত থেকে বেগুন পোড়া ভাত মেখে খেতো—আর আজ আমি হইচি নাকি ডাইনি—

—চুপ করো দিদি। এসব কথা আমি সব জানি। এখন কি খাবে তাই বলো—

নিস্তারিণী মিনতির সুরে বল্লে—দুটো ভাত—

—না, আমায় বকিও না। সারাদিন কাজ ক'রে দুঃখধান্দা ক'রে এলাম। দুটো মুড়ি নিয়ে এসেচি—

—শোন ছোটবৌ, অভিলাষ আজ গরম মুড়কি মেখেচে, তারা বলে গেল—

—না, সে সব হবে না। গুড়ের মুড়কি জ্বর হ'লে খায় না। দুটো তেল নুন দিয়ে মুড়ি মেখে দিগ, খেয়ে এক ঘটি জল খেয়ে আজ রাত্তির মত পড়ে থাকো। শুনেচ কাণ্ড, বাজারে নাকি চালের পালি দেড় টাকা! ভাত আর খাতি হবে না। বলাই আর কত রোজগার করবে? কি ক'রে এই বিধবার পুরী চালাবে? ধান ফুরিয়ে এসেচে, এবার আমাদের মত গরীবদের না-খেয়ে মরণ।

নিস্তারিণী শুব্ধ হয়ে শুনলে। অসুস্থতার দরুণ সে বহুদিন অবধি বৈষয়িক ব্যাপারে নিস্পৃহ, তবুও দেড় টাকা এক পালি চাল শুনে সে যেন অত জ্বরের ঘোরের মধ্যেও চমকে গেল। সেকালে যে তাদের গোলার ধান বিক্রি হয়েচে,—আঠারো আনা ক'রে সরু বাঁশলা কি চামরমণি ধানের মন। মনে আছে একবার তার প্রথম পুত্রের অন্নপ্রাশনের জন্য গোলা থেকে পঁচিশ টাকার ধান বিক্রি হয়—পাঁচ সিকা ছিল এক মন ধানের দাম।

নিজের হাতে সে কত ধান বিলিয়ে দিয়েচে···একবার গাঁয়ে আকাল হয়েছিল, টাকায় সাড়ে তিন সের হয়ে উঠলো চালের দাম। বামুনপাড়ার মেজ গিন্নি একদিন তাকে বাড়ীতে ডেকে বল্লেন,—"বৌ, তোমায় একটা কথা বলি। খাওয়াদাওয়ায় বড্ড কষ্ট, দু'মন ধান আমাকে ধার দিতে হবে। ঈশ্বরের ইচ্ছেয় তোমার কোনো অভাব নেই। গোলা আরও উথলে উঠুক তোমার।" সে শাশুড়ীকে লুকিয়ে দু'মন ধান বার করে দিয়েছিল গোলা থাকে। শাশুড়ী চিরকালের খাণ্ডার, কাউকে কিছু জিনিস দেওয়া পছন্দ করতো না কখনো। কিন্তু তখনকার দিনে এ সংসারে তার প্রতিপত্তি ছিল অন্য রকম। সে যা করবে তাই হবে। তার ওপর কথা বলবার কেউ ছিল না। কোথায় গেল সে সব দিন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে। নির্ম্মলা এক বাটি দুধ নিয়ে এসে বল্লে—ও দিদি, খেয়ে নাও একটু দুধ।

নিস্তারিণী বল্লে—আমার এখানে একটু বোস ছোটবৌ—কেউ বলে না।

নির্ম্মলার বেশীক্ষণ এক জায়গায় বসবার জো নেই। এখুনি সব খেতে চাইবে, শেষ রাত্রে উঠে চার কাঠা ধানের চিঁড়ে কুটতে হবে বাঁড়ুজ্যেদের।

তারপর আবার যে একা, সেই একা। সারা দিনরাত আজ একটি মাস ধরে একাই শুয়ে থাকতে হচ্ছে। নির্মলা তাকে ধরাধরি ক'রে ঘরের মধ্যে শুইয়ে দিয়ে গেল।

একদিন দু'দিন করে কতদিন যে কাটলো, নিস্তারিণীর কোনো খেয়াল নাই। কেবল আব্‌ছা আব্‌ছা দিনগুলো আসে, সে সব দিনের প্রতিটি মুহূর্ত যেন নিঃসঙ্গ, কেবল ছোট্ট খোকা পিনটুকে দেখতে ইচ্ছে করে···কিন্তু তার মা তাকে পাঠায় না, একটুও বসতে দেয় না কাছে। পুত্রবধূ হয়ে শাশুড়ীকে দেখতে পারে না ··তার নাকি ছোঁয়াচে রোগ হয়েছে বলে। আর কেবল সবাই বকে, সবাই বকে।

একদিন সে শুয়ে শুয়ে লক্ষ্য করলে আর আকাশে বৃষ্টি হয় না। হল্‌দে রঙের রোদ বাঁশঝাড়ে, আমগাছের মাথায়। তেলাকুচো লতায় সাদা সাদা ফুল ধরেছে, বলাইয়ের হাতে পোতা উঠোনের রাঙা ডাঁটা শাক ক্রমে ফুরিয়ে আসছে। বর্ষাকাল তা হ'লে চলে গিয়েছে।

পুত্রবধূ আমতলায় কাঠ কাটছে। জিগ্যেস করলে—ও বৌমা, এটা কি মাস?

—সে খোঁজে কি দরকার তোমার?

—বল না বৌমা?

—শেষা ভাদ্দর। তোমার কি হুঁশ পোড়েন আছে? সেদিন চাপড়া ষষ্ঠী গেল, খোকাকে তোমার আশীর্বাদ করা দরকার। তোমার কাছে গিয়ে ডাকলে, তা যদি একটা কথা বল্লে—

বিকেলে ও-পাড়ার বুধো গোয়ালার মা দেখা করতে এসে বল্লে—ও মা, এ কি চেহারা হয়ে গিয়েছে! আহা, কতদিন হয়েছে আসিনি—বলি, শুনচি বড্ড অসুখ, একবার দেখে আসি। উদুরী হয়েছে বুঝি, পেট যে ফুলেচে বড্ড। সোনার পিরতিমে চেহারা ছিল বৌমার। আমি তো আজকের লোক নই, যখন হরি প্রথম বিয়ে ক'রে এল—ওই আমতলায় দুধে আলতার পিঁড়িতে দাঁড়াল, বেশ মনে আছে। রূপে একেবারে ঝল্‌ক দিয়ে গেল যেন। সে চেহারার আর কিছু নেই। এমন নক্ষি বৌ—আহা, তার এত কষ্টও ছেল অদেষ্টে।

নিস্তারিণী যেন সব বিষয়ে নিস্পৃহ, উদাসী হয়ে পড়েছে। এ সব কথা শুনে যায় বটে, কিন্তু কার বিষয়ে কে যেন কথা বলছে। সে কালের সে বড়বৌ তো কোন্ কালে মরে হেজে গিয়েছে। সে রূপসী, লক্ষ্মীর মত সংসারজোড়া বড়বৌ কোথায় আজ?···কেবল খেতে ইচ্ছে হয়। পান্তাভাত কতকাল খায় নি। কেউ দেয় না—দেখাই করে না এসে। সন্ধ্যার পরে নির্মলা এসে একটু কাছে বসে। বলে—ও দিদি, তোমার জন্যি একটা জিনিস এনেছি মনিববাড়ী থেকে।

নিস্তারিণী ব্যগ্রভাবে বলে—কি—কি?

—চুপ করো। দু'টো তালের বড়া। গিন্নি ভাজছে তা আমাকে খেতে দেলে—

—কতকাল খাইনি। দে—

নির্মলা বেশীক্ষণ বসতে পারে না, রান্নাঘরে খই ভেজে দিতে হবে জামাই অভিলাষকে। তারা ব'লে দিয়েছে—কাল মুড়কি মাখবে সকালবেলা। সে মুড়কির ব্যবসা করে, কিন্তু খই

ভাঙ্গা কাজটা মেয়েমানুষের, পুরুষের নয়—ওটা শাশুড়ীর বিনা সাহায্যে সম্পূর্ণ হয় না।

রান্নাঘরে যেতে সাধনের বৌ বল্লে—কাকীমার বুড়ীর কাছে রোজ বসা চাই-ই। অমন ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে—পাপের দেহ তাই কষ্ট পাচ্ছে—নইলে মরে' যেত কোন্‌কালে।

নির্ম্মলা ধমক দিয়ে বল্লে—অমন বলিস নে বৌমা, মুখে পোকা পড়বে। সতী নক্ষি মেয়ের নামে কিছু বোলো না। তোর আপন শাশুড়ী না? তুই ও-সব কথা মুখে বের করিস্ কি ক'রে? আজই না হয় ও অমন হয়ে গিয়েচে—ও যে কি ছিল, আমি সব দেখিচি। এই সংসারের যা কিছু ঝক্কি চিরডাকাল ও পুইয়েছে। দেওরদের মানুষ করা, বিয়ে থাওয়া দেওয়া—ও না থাকলে সংসার টিকতো না। আজ না হয় ওর—

সাধনের বৌ ঠোঁট উল্টে বল্লে—হোক গে যাক বাপু। ও নিজের ছেলে খেয়েছে—ওর ওপর আমার একটুকু ছেদ্দা নেই। যতই বলো।

—ও খেয়েছে, কি বলিস্ বৌমা? ও ছেলে খেয়েছে! যাবার অদেষ্টে যায় চলে। কার দোষ দেবো। তা হলে তো তোকেও বলতে পারি—তুই সোয়ামী খেয়েছিস।

এই কথার উত্তরে খুড়শাশুড়ী ও বৌয়ে তুমুল ঝগড়া বেধে উঠলো।

আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি। পুজো প্রায় এসে পড়েছে। নিস্তারিণী একেবারে উত্থান-শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। দিনের অর্দ্ধেক সময় তার জ্ঞান থাকে না। এক একবার চেতনা সজাগ হয়ে ওঠে, তখন কেবল এদিক-ওদিক চেয়ে নাতিকে খোঁজে, নির্ম্মলাকে খোঁজে। ওর মলিন বিছানা ও সারা দেহে কেমন একটা দুর্গন্ধ ব'লে আজকাল কেউই কাছে আসতে চায় না। কেবল খাওয়ার সময় কোনদিন নির্ম্মলা, কোনদিন বা সাধনের বৌ দুটি ভাত দিয়ে যায়। সেদিনও চোখ মেলে ভাত খাবার চেষ্টা করলে—কিন্তু পারলে না। অনেকক্ষণ পরে পুত্রবধূ বল্লে—ভাত খাওনি যে, খাইয়ে দেবো?

নিস্তারিণী অবাক হয়ে গেল অসুখের ঘোরের মধ্যেও। বল্লে—তাই দে বৌমা।

সাধনের বৌ ভাত দুটি খাইয়ে এঁটো থালা নিয়ে চলে গেল। একটু পরে নির্ম্মলা বাড়ী এল। রোগীকে দেখতে গিয়ে ওর মনে হ'ল অবস্থা ভালো নয়। আপন মনে বল্লে—ঠাকুর, ওকে মুক্তি দাও, বড্ড কষ্ট পাচ্ছে—

প্রতিদিন সন্ধ্যায় যেমন নিস্তারিণীর জ্ঞান হয় আজও তেমনি হ'ল। জা'কে অবোধ বালিকার মত আবদারের সুরে বল্লে—দুটো পান্তাভাত আর ইলিশ মাছ ভাজা খাবো—

নির্ম্মলা দু'তিন দিন চেষ্টার পরে অতি কষ্টে এই যুদ্ধের বাজারে ইলিশ মাছ জুটিয়ে এনেছিল, কিন্তু জা'কে খেতে দিতে পারে নি।

নিস্তারিণীর অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে ঝুঁকলো পরদিন দুপুর থেকে।

সে অসুখের ঘোরে কোন্ বিস্মৃত পথ বেয়ে ফিরে গেল তার যৌবনদিনের দেশে। বাঁড়ুজ্যেদের ন'গিন্নী যেন এসে হেসে হেসে বলচেন, 'আমায় আজ দু'কাঠা চাল ধার দিতে হবে বৌ। বৌমা তাড়িয়ে দিয়েচে বাড়ী থেকে—তুমি না দিলে দাঁড়াবো কোথায়?'…যে সব লোক

কত কাল আগে চলে গিয়েচে, তারা যেন এসে দিনরাত ওর বিছানার চারিপাশে ওকে ঘিরে ভিড় করচে। বহুদিন পূর্ব্বের শরৎ-অপরাহ্ণের মত হাট থেকে ফিরে ওর স্বামী যেন হাসি-মুখে বলচে—ও বড়বৌ, কলা বিক্রির দরুণ টাকাগুলো এই নাও, তুলে রেখে দাও—আর এই ইলিশ মাছটা—ভারি সস্তা আজ হাটে—

ওর সব দুঃখ, সব অপমান, অনাদরের দিনের হঠাৎ আজ এমন অপ্রত্যাশিত অবসান হ'ল কিভাবে? নিস্তারিণী অবাক হয়ে যায়, বুঝতে পারে না কোন্‌টা স্বপ্ন—কোনটা সত্য। সে একগাল হেসে স্বামীর হাত থেকে ইলিশ মাছটা নেবার জন্যে হাত বাড়ায়।

নির্ম্মলা চোখ মুছতে মুছতে বল্লে—সতী নক্ষী সগ্‌গে চলে গেল—বৌমা পায়ের ধুলো নে—তারপর সে নিজেও ঝুঁকে পড়ে মাতৃসমা বড় জায়ের পায়ে হাত ঠেকায়।

গায়ে হলুদ

শ্রাবণ মাসের দিন, বর্ষার বিরাম নেই, এই বৃষ্টি আসছে এই আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্চে। ক্ষেতে আউস ধানের গোছা কালো হয়ে উঠেচে, ধানের শিষ দেখা দিয়েচে অধিকাংশ ক্ষেতে।

পুঁটি সকালে উঠে একবারে চারিদিকে চেয়ে দেখলে—চারিদিক মেঘে মেঘাচ্ছন্ন। হয়তো বা একটু পরে টিপ-টিপ বিষ্টি পড়তে শুরু ক'রে দেবে। আজ তার মনে একটা অদ্ভুত ধরণের অনুভূতি, সেটাকে আনন্দও বলা যেতে পারে, ছদ্মবেশী বিষাদও বলা যায়। কি যে সেটা ঠিক ক'রে না যায় বোঝা, না যায় বোঝানো। আজ তার বিয়ের গায়ে-হলুদের দিন। এমন একটা দিন তার বারো বৎসরের ক্ষুদ্র জীবনে এইবার এই প্রথম এল। সকালে উঠতেই জ্যেঠিমা বলেচে—ও পুঁটি, জলে ভিজে ভিজে কোথাও যেন যাস্ নি; আর তিনটে দিন কোনও রকমে ভালোয় ভালোয় কেটে গেলে যে বাঁচি।

আজ কি বার?—মঙ্গলবার! শনিবার বুঝি বিয়ের দিন। পুঁটির মনে সত্যিই কেমন হয়, আনন্দের একটা ঢেউ যেন গলা পর্য্যন্ত উঠে আটকে গেল। বিয়ে বেশি দূরে কোথাও নয়, এই গ্রামেই, এমন কি এই পাড়াতেই। এক ঘর ব্রাহ্মণ আজ বছরখানেক হ'ল অন্য জায়গা থেকে উঠে এসেচেন এখানে, দুখানা বড় বড় মেটে ঘর বেঁধেচেন—একখানা রান্নাঘর। এতদিন ধ'রে সে সঙ্গিনীদের সঙ্গে সেই বাড়ীতে কুল পাড়তে গিয়েচে, সত্যনারায়ণের সিন্নি আনতে গিয়েচে, যখন পাড়ার প্রান্তের ঘন জঙ্গল কেটে সে ভদ্রলোক বাড়ী তৈরি করেন ঘাটে যাবার পথের একেবারে ডান ধারে, তখন সে কতবার ভেবেচে এই ঘন বনের মধ্যে বাড়ী ক'রে বাস করবার কার না জানি মাথাব্যথা পড়ল।

কে জানত, সেই বাড়ীটাই—আজ একবছর এখনও পোরেনি—তার শ্বশুরবাড়ী হবে!

কতদূর আশ্চর্য্যের কথা, কতদূর বিস্ময়ের কথা, ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। অথচ তারই ক্ষুদ্র জীবনে এমন একটা মহাশ্চর্য্য ব্যাপার সম্ভব হল! যখনই সে এ কথাটা ভাবে তখনই সে স্তব্ধ, তার মন স্তব্ধ, যেন কতদূরে কোথায় চলে যায়।

ঐ ভদ্রলোকের একটি মাত্র ছেলে, নাম সুবোধ, তারই সঙ্গে ওর বিয়ের সম্বন্ধ হয়েচে। সুবোধকে এই সম্বন্ধের আগে তাদের বাড়ীতে কয়েকবার যাতায়াত করতে দেখেচে—বেশ ফর্সা, লম্বামত মুখ, এবার ম্যাট্রিক দিয়েচে, এখনও পরীক্ষার ফল বার হয় নি। আগে আগে, সত্যি কথা বলতে গেলে, সুবোধের মুখ পুঁটি তত পছন্দ করতো না। তার দাদার সঙ্গে যতবার এসেচে তাদের বাড়ীতে—পুঁটি ভাবতো—দেখো না ঘোড়ার মত মুখখানা। কিন্তু আজকাল আর সুবোধের মুখ ঘোড়ার মত ত মনে হয়ই না, মনে হয় বেশ চমৎকার মুখ। গ্রামের ছেলেদের মধ্যে অমন চোখ, অমন রং, অমন মুখের গড়ন কার আছে?

রায়েদের পাঁচি সেদিন বলেছিল তাকে—হ্যাঁরে, তুই যে বড় ঘোড়ামুখো বলতিস, তোর অদেষ্টে শেষকালে কিনা সেই ঘোড়ামুখোই জুটল!

পুঁটি মারতে ছুটে গিয়েছিল তার পিছু পিছু।

পুঁটির বাবা গোলার দোরে দাঁড়িয়ে ধান পাড়বার ব্যবস্থা করচে। তার বাবা বেশ চাষীবাসী গেরস্ত। পুঁটিদের বাড়ীতে চারটা বড় বড় ধানের আউড়ি আছে, গোলা আছে একটা। আউড়ি জিনিসটা গোলার চেয়ে অনেক ছোট, তিন চার বিশ ধান ধরে—আর একটা গোলায় ধরে এক পৌটি অর্থাৎ ষোলো বিশ ধান।

তাদেরও ধান আছে গোলা ভর্ত্তি, সব ক'টা আউড়ি ভর্ত্তি। কলকাতায় চাকুরী করেন এ পাড়ার হরিকাকা, তিনি মাঝে মাঝে গাঁয়ে এসে পুঁটির বাবাকে বলেন—আর কি রায় মশায়, এ বাজারে ত আপনিই রাজা। গোলা ভর্ত্তি ধান রেখেচেন ঘরে, আপনার মহড়া নেয় কে? কলকাতায় 'কিউ'তে দাঁড়িয়ে এক সের চাল নিতে হচ্চে—আর আপনি—।

পুঁটি জিগ্যেস্ করেছিল—কিসে দাঁড়িয়ে চাল নিতে হয় বাবা, বলছিল হরিকাকা?

—কে জানে কিসে দাঁড়িয়ে, তুই নিজের কাজ কর, আমি নিজের করি—মিটে গেল।

—তুমি জান না বুঝি ও কথাটার মানে? না বাবা?

—না জেনেও ত পায়ের ওপর পা দিয়ে এ বাজারে চালিয়ে দিলাম মা। কলকাতার মুখ না দেখেও ত বেশ যাচ্চে।

কলকাতায় নাকি মানুষের এক সের চালের জন্যে চার ঘণ্টা কোথায় নাকি দাঁড়িয়ে থাকতে হয়—কি যে বাড়ীতে তার বিয়ে হচ্ছে, তাদের অবস্থা এত ভালো নয়। সুবোধ যদি পাশ করে, তবে হরিকাকা ভরসা দিয়েচেন কলকাতায় নিয়ে গিয়ে তাকে ওঁর আপিসে চাকুরী ক'রে দেবেন। তা হ'লে তাকেও কি কলকাতায় গিয়ে বাসায় থাকতে হবে আর সেই কিসে দাঁড়িয়ে রোজ এক সের চাল নিয়ে এসে রাঁধতে হবে? সে বড় কষ্ট—তবে, মানে সুবোধ যদি সঙ্গে থাকে, সে বোধ হয় সব রকম কষ্টই করতে প্রস্তুত আছে।

তাদের ধানের গোলা থেকে ধান পাড়া হচ্চে, খাবরাপোতা থেকে সীতানাথ কলু

আড়ৎদার এসেচে—ধান কিনে নিয়ে যাবে। বিয়ের খরচপত্র ধান বেচে করতে হবে কিনা।

ওর জ্যেঠিমা বললেন—ও পুঁটি, আজ কোথাও বেরিও না। নাপিত ও-বাড়ী থেকে হলুদ নিয়ে আসবে, সেই হলুদ গায়ে দিয়ে তোমায় নাইতে হবে।

এমন সময় সাধন জেলে এসে ভিজতে ভিজতে উঠোনে দাঁড়াল। হাত জোড় ক'রে মাথা নীচু করে প্রণাম করে বললে—প্রাতপেন্নাম।

তার বাবা বললে—ও সাধন, বাবা তোমায় ডেকেছি যে একবার। আমার যে কিছু মাছের দরকার এই শনিবারে।

কি জানি কেন, পুঁটির বুকটা দুলে উঠল। এই শনিবার—এই শনিবারে তা হলে সত্যিই তার—

সাধন বললে—আজ্ঞে, মাছের যে বড্ড গোলমাল যাচ্চে। গাঙে কি মাছ আছে? ডুমোর বাঁওড়ের মাছ সব যাচ্চে কলকাতায়। বিরাশি টাকা দর। এমন দর বাপের জন্মে কোনও কালে শুনি নি রায় মশায়। এক সের দেড় সের পোনা ইস্তক পড়তে পাচ্চে না। মরগাঙে বাঁধাল দিয়েলাম—একদিন কেবল এক সাড়ে এগার সের গজাড় মাছ—

পুঁটির বাবা বিস্ময়ের সুরে বললে—সাড়ে এগার সের গজাড়! এমন কথা ত কখনও শুনি নি—

—অরিবৎ গজাড় রায় মশায়। মাছের এমন দর, গজাড় মাছই বিক্রি হয়েল দশ আনা সের।

পুঁটি আর সেখানে দাঁড়াল না। মাকে এমন আজগুবি খবরটা দিতে ছুটল বাড়ীর মধ্যে। বিষ্টি একটু থেমেচে, একটু কোথাও বেরুতে পারলে ভালো হ'ত। তার জীবনে যে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার হতে চলেচে এ কথাটা কারও সঙ্গে আনন্দ করে বলাও চলে না। বেহায়া বলবে, নিন্দে করবে। কেবল বলা চলে তার সমবয়সী পাঁচি, আর কেষ্টি জেলেনীর মেয়ে টুনির কাছে। আর একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার—তার চেয়ে অন্তত সাত বছরের বড় লতিদিদির এখনও বিয়ে হয় নি—অথচ লতিদিকে সবাই বলে সুন্দরী, লতিদির বাপের অবস্থা ভালো। লতিদি লেখাপড়া জানা ভালো! গান করে, ওর বাবা যখন কলকাতায় চাকরী করত, তখন লতিদি স্কুলে পড়ত সেখানে। কত বই পড়ে বসে বসে দুপুর বেলা। পুঁটি ওদের বাড়ী যায় যখনই তখনই দেখে লতিদি বই মুখে বসে। পুঁটি ভাল লেখাপড়া জানে না, বইয়ের নাম পড়তে পারে না, লতিদি একটু ঠ্যাকারে, সে লেখাপড়া জানে না বলে বুঝি আর মানুষ না?

তাকে বলে—তুই বই-টই নাড়িস নে পুঁটি। কি বুঝিস্ তুই এর আস্বাদ?

পুঁটি হয়ত বলে—এ কি বই বল না লতিদি?

—যাঃ যাঃ, আর বইয়ের খবরে দরকার নেই। শরৎ চাটুজ্যের নাম শুনেচিস্? কোথা থেকে শুনবি? তোরা শুধু জানিস্ ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে কি করে চিঁড়ে কুটতে হয়। তাই করগে যা—এদিকে কেন আবার?

আচ্ছা, আজ তার লতিদিকে বলতে ইচ্ছে হচ্চে—কই লতিদি, তুমি এত বই পড়ে টরে বসে আছ, এত সব নাম জান—কই তোমার ত আজও বিয়ে হ'ল না। আমার জীবনে এত বড় একটা আশ্চর্য্যি কাণ্ড ত টুক্ করে ঘটে গেল। ধানের নিন্দে কর, বাবার গোলায় ধান ছিল বলে ত আজ—কই তোমাদের ত—তারপর ম্যাট্রিক পাশ বর। এ গাঁয়ে পাশ করা ছেলে একমাত্র আছে মুখুজ্যেদের জীবন দা'। সে নাকি দুটো পাশ—কোথায় চাকরী করচে যেন—ঐ দিকে কোথায়। যার সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্চে, সে মুখ্যু নয়। পাশের খবর বেরুবার দেরি নেই—বাবা বলেন, সুবোধ নিশ্চয়ই পাশ করবে। হে ভগবান, তাই করো, পাশ যেন সে করে, সত্যনারাণের সিন্নি দেবে সে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে।

নাপিত এসে বললে—মা ঠাকরুণ, ও-বাড়ী থেকে দেখে এলাম। গায়ে হলুদের পর বেলা দশটার পর। আপনাদের যা দিতে হবে তার আগে দিয়ে দেবেন।

গায়ে হলুদের তত্ত্ব আসবে ওবাড়ী থেকে। কি রকম জিনিসপত্র না জানি আসে। পুঁটির মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। একখানা লাল কাপড় নিশ্চয়ই তারা দেবে। পুঁটির মোটে তিনখানা শাড়ী আর একখানা ডুরে শাড়ী আছে মায়ের বাক্সে তোলা। এবার তার অনেক কাপড় হবে, গহনাও হবে। পাঁচ ভরি সোনা দেবার কথাবার্ত্তা হয়েচে। এতদিন দুটি দুল ছাড়া অন্য কোনও গহনা তার অঙ্গে ওঠে নি—অথচ ঐ কুমারী মেয়ে লতিদিরই হাতে ছ'গাছা করে চুড়ি, গলায় লকেট্ ঝোলানো হার, কানে পাশা, হাতে আংটিও আছে। ও থাকতো শহরে, সেখানে মেয়েদের চালচলন আলাদা। এ সব পাড়াগাঁয়ে কুমারী মেয়েরা কাঁচের চুড়ি ছাড়া আবার কি গহনা পরে? অত পয়সাও নেই তার বাপের। গোলায় দুটো ধান আছে মাত্র, নগদ পয়সা কোথায়। যা কিছু করতে হয়, সে ঐ ধান বেচে।

ভীষণ বৃষ্টি এসেচে। সঙ্গে সঙ্গে সামান্য ঝড়। রান্নাঘরের ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে বকুনা বাছুরটা ভিজচে। কচুপাতার জল জমে আবার গড়িয়ে গড়িয়ে পড়চে। তাদের কৃষাণ বীরু মুচি বলচে—ও দিদি ঠাকুরোণ, তা একটু তামাক খাও মোরে, বিয়েবাড়ী যে মনেই হচ্চে না। দু'দশ ছিলিম তামাক পোড়বে তবে ত বোঝবো যে নগনশা লেগেচে।

পুঁটি বীরুকে ধমক দিয়ে বললে—যাঃ, তোর আর বক্তৃতা দিতে হবে না। তামাক আমি কোথায় পাবো? কাকীমার কাছে গিয়ে চাইগে যা—

একটু বেলা হয়েচে। বাড়ীতে অনেক লোক এসেচে বিয়ের জন্যে। বিয়েবাড়ীর মত দেখাচ্চে বটে—কুমোরপুরের কাকীমা, পাঁচঘরার মাসীমা তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসেচেন—আজ বেলা এগারোটার সময়ে আরও একদল আসবে, ইষ্টিশানে গাড়ী গিয়েচে। মেয়েরা সবাই দল বেঁধে নদীতে নাইতে গেল। কুমোরপুরের কাকীমা যাবার সময়ে তাকে বলে গেল—বাঁড়ুয্যে বাড়ী পিঁড়ি চিত্তির করতে দিয়ে আসা হয়েচে, দেখে আসিস্ পুঁটি সে-দুখানা পিঁড়ি হয়েচে কি-না।

কাকীমার এটা অন্যায় কথা। তার লজ্জা করে না? নিজের বিয়ের পিঁড়ি নিজে বুঝি

সে চাইতে যাবে ? এত বেহায়া সে এখনও হয় নি।

তার বাবা চণ্ডীমণ্ডপ থেকে হেঁকে বললেন—ও পুঁটি, হাতায় করে একটু আগুন নিয়ে এস মা—

চণ্ডীমণ্ডপের দোর পর্যন্ত গিয়ে ও শুনলে ওর বাবা আর একজন অজ্ঞাত লোকের মধ্যে নিম্নোক্ত কথাবার্ত্তা :

—তা হলে পাল্‌কির বন্দোবস্ত দেখতে হয়—

—আজ্ঞে পাল্‌কি কোথায় মিলবে ? ঘোলডুবুরির কাহারপাড়া নির্ব্বংশ। পাল্‌কি বইবার মানুষ নেই এ দিগরে।

—তবে ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে এস বন্‌গাঁ থেকে।

—এ কাদা-জলে দশ টাকা দিলেও আসবে না। আসবার রাস্তা কই ?

—ওরা বিদেশী লোক। বর আসবার ব্যবস্থা আমাদেরই করে দিতে হবে, বুঝলে না ? আমরাই পারচি নে, ওরা কোথায় কি পাবে ? হিম হয়ে বসে থেকো না। যা হয় হিল্‌লে লাগিয়ে ছাও একটা।

—আচ্ছা বাবু, বলদের গাড়ীতে বর আনলি কেমন হয় ?

—আরে না না—সে বড় দেখতে খারাপ হবে। সে কি—না না। শুন্‌চি ওরা ইংরিজি বাজনা আনচে। বলদের গাড়ীর পেছনে ইংরিজি বাজনা বাজিয়ে বর আসবে, তাতে লোক হাসবে।

—কেন বাবু তাতে কি ? বলদের গাড়ীতে কি আর বর যায় না ? একেবারে আপনাদের বাড়ীর পেছনে এসে থামবে—সেই তো ভালো।

—বলদের গাড়ীতে বর যাবে না কেন ? সে কি আর ভদ্দরলোকের বর যায় ? তা ছাড়া পেছনের ওপথ আইবুড়ো পথ। ওখান দিয়ে বর আসবে না, সামনের তেঁতুলতলার রাস্তা দিয়ে বরকে আনতে হবে। তুমি আজই যাও দিকি ষষ্ঠীতলা। সেখানে ক'ঘর কাহার আছে শুনিচি। সেখান থেকেই পাল্‌কি আনাতে—

—সে যে এখান থেকে তিনকোশ সাড়ে তিনকোশ রাস্তা বাবু।

পুঁটি সেখানে আর দাঁড়ালো না। সুবোধ আসবে বর সেজে বলদের গাড়ীতে ? হি—হি—সে বড় মজা হবে এখন। ধুতরো ফুলের মালা গলায় দিয়ে ?

দৃশ্যটা মনে কল্পনা করে নিয়েই হাসতে হাসতে পুঁটির দম বন্ধ।

—ও তিনু—তিনু রে—শোন্ শোন্ একটা মজার কথা—

তিনু চার বছরের খুড়তুতো ভাই। উঠোনের নীচে দিয়েই যাচ্ছে। সে মুখ উঁচু করে ওর দিকে চেয়ে বললে—কি লে ডিডি ?

—জানিস্ ? এই আমাদের বাড়ী বর আসবে—

—বল ?

—হ্যাঁ-রে। ধুতরো ফুলের মালা পরে বলদের গাড়ী চেপে ইংরিজি বাজনা বাজিয়ে—হি—হি—

তিনু না বুঝে হাসলে—হি—হি—

এই সময়ে ওদের জ্যাঠাইমা বাড়ীর ছেলেমেয়েকে ডাক দিলেন—ওরে, সবাই এসে কাঁটাল খেয়ে যা—ও হিমু, পান্ত ভাত কে কে খাবে ডাক দিয়ে নিয়ে আয়। এক হাঁড়ি পান্ত রয়েচে সেগুলো কাঁটাল দিয়ে ওঠাতে তো হবে। ভাত ফেলতে পারবো না এই যুধ্যের বাজারে—

পান্ত ভাত ও কাঁঠাল পুঁটির অতি প্রিয় খাদ্য। কিন্তু আজ এখন তার খাবার নাম করবার জো নেই—খিদেও পেয়েছিল, ইচ্ছে করলে সে কলসী থেকে কাঁঠালবীচি ভাজা আর মুড়ি লুকিয়ে পেড়ে নিয়ে খেতে পারতো—কিন্তু সে ইচ্ছে তার নেই। তাতে ভগবান রাগ করবেন। আজকের দিনে সে ভগবানকে রাগাবে না।

বেলা বাড়লো। ও বাড়ীতে শাঁক ও হুলুর শব্দ শোনা গেল। অবিশ্যি খুব কাছে নয় পুঁটির ভাবী শ্বশুরবাড়ী। তা হলেও শাঁকের শব্দ আসবার মত দূরও নয়।

ওর খুড়তুতো বোন শ্যামা বললে—ওই শোন দিদি, দাদাবাবুর গায়ে হলুদ হচ্চে—

পুঁটি ধমক দিয়ে বললে—চুপ্। মেরে ফেলে দেবো। দাদাবাবু কে?

—বা-রে, হয়েচেই তো—আর ত দুদিন দেরি—

—না। তা হোক্। আগে থেকে বলতে নেই।

—জ্যাঠাইমা তো বলচে?

—কি বলচে?

—বলচে, আমাদের জামাইয়ের গায়ে হলুদ হচ্চে—সেখান থেকে তত্ত্ব নিয়ে নাপিত এবার এসে পৌঁছে যাবে—

—তা বলুক গে। আমাদের বলতে নেই।

—আচ্ছা দিদি—দাদাবাবু—ইয়ে সুবোধবাবু পাশ করেছে?

—খবর এখনও বের হয় নি।

—আমি ও পাড়ায় রাধীদের বাড়ী গিইছিলাম এই এট্টু আগে। রাধীর দাদা পাশ করেচে, কাল বিকেলে কলকাতা থেকে ওর কাকা খবর দিয়েচে।

—তোর দাদাবাবুর—ইয়ে মানে ওর—দূর, ওই কেশববাবুর ছেলের খবর কে পাঠাবে কলকাতা থেকে? ওদের তো কেউ নেই কলকাতায়।

একটু পরে ওদের বাড়ীতে শাঁক বেজে উঠলো, হুলু পড়লো। নাপিত তত্ত্ব নিয়ে আসচে তেঁতুলতলার পথে, বাড়ী থেকে দেখা গিয়েচে।

পুঁটির বুক আনন্দে দুলে উঠলো—জ্যাঠাইমা বলছিলেন, আশীর্ব্বাদ হয়ে গেলেও বিয়ে না হতে পারে, কিন্তু গায়ে হলুদ হয়ে গেলে বিয়ে নাকি আর ফেরে না।

এবার তা হোলে সেই আশ্চর্য্য ব্যাপারটা তার জীবনে ঘটে গেল।

কেউ আর বাধা দিতে পারবে না। পাড়াগাঁয়ে কত রকমে ভাঙ্‌চি দেয় লোকে। তার বিয়েতেও ভাঙ্‌চি দিয়েছিল। বলেছিল, মেয়ের রং কালো, মুখ-চোখ ভালো না—লেখাপড়া

জানে না—আরও কত কি। কিন্তু সুবোধ—না। ছিঃ, ও নাম করতে নেই, নাম হিসেবে মনে ভাবতে নেই।

তারপর বাকি অনেকগুলো কি ব্যাপার স্বপ্নের মত তার চোখের সামনে দিয়ে ঘটে গেল। শাঁকের ডাক, হুলুধ্বনি, মা, কাকিমা, জ্যাঠাইমা তাকে তেলহলুদ মাখিয়ে দিলেন। গায়ে-হলুদের তত্ত্ব এল লালপাড় শাড়ী, তেলহলুদ, একটা বড় মাছ, এক হাঁড়ি দই। তার সমবয়সী বন্ধু তিনজন খেতে এল তাদের বাড়ী। তাকে কাছে বসিয়ে কত যত্ন করে মাছ দিয়ে, দই দিয়ে, মা জ্যাঠাইমা কত আদর করে খাওয়ালেন, কত মিষ্টি কথা বল্‌লেন। সোনার পিঁড়িতে সিঁদুর দেওয়া হ'ল, প্রদীপ দেখান হ'ল,—যাতে শূন্য ধানের গোলা সামনের ভাদ্র মাসে আউশ ধানে অন্তত অর্দ্ধেকটা পুরে যায়। বাবা বলেন, গোলার ধান খালি হয়ে যেতো না। মধ্যে কি একটা গভর্ণমেণ্টের হাঙ্গামা এল—কেউ গোলায় ধান জমিয়ে রাখতে পারবে না। তাতেই অনেক ধান কর্জ্জ দিতে হ'ল গ্রামের লোকজনকে।

গায়ে হলুদের তত্ত্বে আরও অনেক জিনিস এসেছিল, খাওয়া-দাওয়ার পরে গাঁয়ের মেয়েরা কেউ কেউ দেখতে এল—তখন সে নিজেও দেখলে। আগে লজ্জায় ওদিকেও সে যায় নি: একটা শাড়ী, একটা ব্লাউজ, সায়া একটা—আলতা, সাবান, আয়না আর গন্ধতেল। এ সব জিনিস তার নিজস্ব। কারও ভাগ নেই এতে। সে ইচ্ছে করে যদি কাউকে দেয় তবেই সে পাবে, নইলে নিজের বাক্সে রেখে দিতে পারে, কারও কিছু বলবার নেই।

সব কাজ মিটতে বেলা দুটো বেজে গেল।

পুঁটির মন ছট্‌ফট্ করছিল, ও পাড়ার লতিদি, হিমি, অন্ন, রাধী -এরা কেউ আসেনি—এদের গিয়ে একবার দেখা দেওয়া দরকার—যাতে তারা বুঝতে পারে যে, তার গায়ে হলুদের মত আশ্চর্য্য ব্যাপারটা আজ সত্যিই ঘটে গিয়েচে। আচ্ছা, যখন ইংরিজি বাজনা বাজিয়ে বর আসবে তাদের বাড়ীর দোরে তেঁতুলতলার ওই পথটা দিয়ে, বোধনতলার কাছে পাল্‌কি নামিয়ে প্রণাম করে—বাজি পুড়বে, লোকজনের হৈ হৈ হবে—ওঃ, সে সময়ের কথা ভাবাও যায় না। দেখে যেন পাড়ার সব মেয়েরা এসে।

সে বেড়াতে বেড়াতে গেল মুখুয্যেবাড়ী। মুখুয্যেগিন্নী ওকে দেখে বল্‌লেন—কি রে পুঁটি, আয় মা আয়। গায়ে হলুদ হয়ে গেল? আহা, এখন ভালোয় ভালোয় দু-হাত এক হয়ে গেলে—বোসো মা, বোসো।

একটু পরে লতিকাও সেখানে এসে হাজির হোল। পুঁটিকে দেখে বললে—ও পুঁটি, তোর আজ গায়ে হলুদ ছিল না? হয়ে গেল? কি তত্ত্ব এল শ্বশুরবাড়ী থেকে?

মুখুয্যেগিন্নী বল্‌লেন—বোস্ মা তোরা। লতি, পুঁটির সঙ্গে গল্প কর। একটু চা করে আনি। যাক্, ভালোই হ'ল, আজকাল মেয়ের বিয়ে দেওয়া যে কি কষ্ট, যে দেয় সেই জানে!

পাশের বাড়ীর জানালা দিয়ে গাঙ্গুলীদের ছোটবৌ ডেকে বললে—ও কে, পুঁটি নাকি?

গায়ে হলুদ হয়ে গেল ? তা কই আমাদের একবার বলতেও তো হয়। এই ত বাড়ীর পেছনে বাড়ী—

পুঁটি বল্‌লে—গেলেন না কেন বৌদি ? আমরা ত বারণ করি নি যেতে। শাঁক যখন বাজলো, তখনও যদি যেতেন—

লতিকা ভাবলে, পুঁটি ছেলেমানুষ এ উত্তরটা দেওয়া ওর উচিত হ'ল না। এখানে ও কথা বলা ঠিক হয় নি। কিন্তু এর পরবর্ত্তী ব্যাপারের জন্যে সে বা পুঁটি কেউ প্রস্তুত ছিল না। গাঙ্গুলীদের ছোটবৌ মুখ লাল করে উত্তর দিলে—কি বল্‌লি ? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা ? আমরা কখনও গায়ে হলুদ দেখি নি, শাঁকে ফুঁ পড়লে অমনি কুকুরের মত ছুটে যাব তোমাদের বাড়ী পাতা পাততে। অত অংখার ভালো না রে পুঁটি। তোমার বাপের বড্ড ধানের গোলা হয়েচে, না ? অমন বিয়ে আমরা কখনও কি দেখিচি জীবনে ? ছেলের না আছে চাল, না চুলো—সংসারে মানুষ নেই বলে হাঁড়ি ঠেলতে নিয়ে যাচ্চে। ছেলের বিদ্যে কত, তা জানতে বাকি নেই—এবার তো ম্যাট্রিক ফেল করেচে -

এখানে লতিকা আর না থাকতে পেরে বল্‌লে—কে বল্‌লে ছোট বৌদি ? সুবোধবাবুর পাশের খবর তো পাওয়া যায় নি ?

—কেন পাওয়া যাবে না ? চিঠি এসেচে ফেল করেচে বলে—ওরা সে চিঠি লুকিয়ে ফেলেচে। বিয়ের আগে ও খবর জানাজানি হতে দেবে না। উনিই হাট থেকে চিঠি আনেন। পোষ্টকার্ডে চিঠি। উনি সন্দের পর সুবোধদের বাড়ী দিয়ে এলেন। আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া—

পুঁটির চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে বিশ্বসংসার লেপে মুছে গিয়েচে। মুখরা দর্পিতা ছোট বৌয়ের মুখের কাছে সে কি করে দাঁড়াবে। চেঁচামেচি শুনে মুখুয্যেগিন্নী হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন, লতিকা ওর হাত ধরে নিয়ে ঘরের মধ্যে গেল।

মুখুয্যেগিন্নী ঘরের মধ্যে এসে চাপা গলায় বললেন—আহা, ছেলেমানুষ—ওর সাধ-আহ্লাদের দিনটা অমন করে বিষ ছড়াতে আছে—ছিঃ ছিঃ—ছ্যাখ তো মা লতি কাণ্ডটা—

কাঠের পুতুলের মত আড়ষ্ট পুঁটির হাত ধরে ততক্ষণ লতিকা বলচে—চল্ চল্ পুঁটি তোকে বাড়ী দিয়ে আসি—ছিঃ, বৌদির কি কাণ্ড ! ও সব কথা মনে করিস নে, মিথ্যে কথা। চল পুঁটি—ভাই—

লতিকার গলার সুরে ও কথার ভাবে কিন্তু পুঁটির মনে হ'ল লতিদিও এ খবরটা জানে—কি জানি হয়তো গাঁয়ের সবাই জানে—সে-ই কেবল জানতো না এতক্ষণ। পথে পা দিয়েই লজ্জায় অপমানে সে ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেলে বললে—লতিদি, আমি কী বলেছিলাম ছোটবৌদিকে ?—খারাপ কথা কিছু ?

ঠাকুরদা'র গল্প

অনেক দিন আগের কথা।

একালে সে জিনিস শুনলে ভাববে গল্পকথা বুঝি, কিন্তু সেকালে দেশের সামাজিক অবস্থা ছিল অন্তরকম, তখন ওরকম সম্ভব ছিল।

যাক আসল গল্পটা বলি :

আমার তখন বয়স কুড়ি-একুশ—একহারা চেহারা, মাথায় বাবরি চুল, গায়ে যথেষ্ট শক্তি রাখি। খেতেও পারি খুব। ভোজসভার নাম-করা খাইয়ে ছিলেন সেকালের আমার পিতামহ তোমাদের বৃদ্ধপ্রপিতামহ ৺বিষ্ণুরাম রায়, যাঁরসার জমিদারবাড়ীতে দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণে পুরো খাওয়ার পর এক হাঁড়ি রসগোল্লা খেয়ে ধুতি চাদর আদায় করে এনেছিলেন। সকলে বলতো নিমাই বংশের নাম রাখবে। তাঁর ডাকনাম ছিল নিমাই।

আষাঢ় মাসের শেষ, ঘোর বর্ষা সেবার। বাবা তার আগের বছর মারা গিয়েছেন সুতরাং বাইশ বিঘে ব্রহ্মোত্তর আমন ধানের জমিতে ধান রোয়ার ভার পড়লো আমার ঘাড়ে। বড়দাদা কুসঙ্গে মিশে অল্পবয়সে গাঁজা ধরেছিলেন, পাড়াগাঁয়ে যা হয়ে থাকে, গাঁজা খাওয়ার দলে তাঁরই সমবয়সী লোক ছিল অনেক, তারা কুপরামর্শ দিয়ে আমাদের পৈতৃক জমি ফাঁকি দিয়ে মৌরসী নেবার চেষ্টা করলে।

একদিন দাদা এসে বল্লেন—খালপারের জমিটা মৌরসী চাইচে একজন, বেশ মোটা সেলামী! দিবি? আমি দাদার নির্ব্বুদ্ধিতা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আমার চেয়ে বয়সে বড়—অথচ তাঁর বুদ্ধি এরকম। কে এমন সুপরামর্শ দিয়েছে কি জানি। বল্লাম—কত সেলামী দিচ্ছে?

—পনেরো টাকা বিঘে।

—জমিগুলো কিন্তু চিরদিনের মত হাত-ছাড়া হয়ে যাবে!

—তাতে কি? এখন সত্তর আশি টাকা হাতে আসবে—

—আমার ওতে মত নেই দাদা।

এই থেকেই দাদার সঙ্গে আমার মতভেদ হয়ে গেল। তিনি আর আমার সঙ্গে কথা বলেন না, মার সঙ্গে বলেন, তাঁর অংশের জমি তিনি আলাদা করে নেবেন, নিজের জমি যা খুশী করবেন, এতে কার কি বলবার আছে—ইত্যাদি।

আমরা চাষীবাসী গৃহস্থ। ধান ছাড়া অন্য আয় নেই, জমি ছাড়া অন্য সম্পত্তি নেই। আষাঢ় মাস এল, ধান রোয়ার সময়। দাদা কিন্তু জমির দিকে একবারও গেলেন না, এক পয়সার সাহায্যও করলেন না। আমি ভেবে চিন্তে মুক্তাপুরের কাজী সাহেবদের বাড়ী গিয়ে হাজির হোলাম। মুক্তাপুরের কাজীরা বেশ অবস্থাপন্ন, তবে বুড়ো কাজী সাহেব শুনেছিলাম খুব রুক্ষ মেজাজের মানুষ—কিন্তু আমার তখন আর কোনো উপায় ছিল না।

কাজী সাহেবের বাড়ী বেশ দোমহলা কোঠা, বাইরে লম্বা বৈঠকখানা। কাজী আবদুর রহমান বসে হুঁকোয় তামাক খাচ্ছিলেন। আমায় দেখে বল্লেন—কোথা থেকে আসা হচ্চে?

তারপর আমার পরিচয় পেয়ে বল্লেন—ও, আপনি বিষ্ণুরাম রায়ের নাতি। তা কি মনে করে?

—আমার কিছু টাকা ধার দিতে হবে দয়া করে, বিশেষ দরকার। রোয়ার খরচ নেই কিছু হাতে।

—টাকা হবে না।

—কাজী সাহেব, না দিলে আমার কোন উপায় নেই। এই তিন ক্রোশ রাস্তা রোদ্দুরে হেঁটে এসেচি, আমার দাদা মানুষ নন, তিনি কিছু দেখাশুনা করলে আজ এই কষ্ট হয় আমার! ধান রোয়া না হ'লে সারা বছর চালাবো কি করে বলুন।

কাজী সাহেব বল্লেন—আপনাকে এখানে আহারাদি করতে হবে। ছেলেমানুষ, এতখানি হেঁটে এসেচেন—এমন সময়, বাড়ী ফিরে যাবেন সে হবে না। আমাদের প্রজা আছে একঘর নাপিত, এই পাশেই বাড়ী তাদের, গোয়ালে রান্নাবান্না করুন, আমি জিনিসপত্তর পাঠিয়ে দিচ্চি। তারাই জলটল তুলে দেবে। নতুন হাঁড়ি কুমোর বাড়ী থেকে আনিয়ে দিচ্চি। আহারাদি করে সুস্থ হোন, ওবেলা কথাবার্ত্তা হবে। স্নান সেরে আসুন দীঘি থেকে।

দিবা সরু চালের ভাত, কই মাছের ঝোল, গাওয়া ঘি, টাটকা দুধ, মর্ত্তমান কলা, আখের গুড়ের পাটালি ইত্যাদি দিয়ে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজনপর্ব্ব সমাধা হ'ল। কাজী সাহেবের আতিথ্যের ও সৌজন্যের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিতে গেলাম দুপুরের পর। তিনি সে কথায় কান না দিয়ে বল্লেন, কত টাকা হ'লে জমি রোয়া হয়? কত বিঘে জমি? বল্লাম, এগারো।

হিসেব করে টাকা গুনে আমার হাতে দিয়ে বল্লেন—না। যখন জমি ছাড়া ভরসা নেই তখন আমার পরামর্শ শুনুন। লাঙল গরু কিনুন, পরের লাঙলের ভরসায় চাস চলে না। হাতিয়ার না থাকলে কি লড়াই হয়?

আমি বল্লাম—টাকা কোথায় পাই বলুন। লাঙল গোরু করতে এখন অন্তত শ'খানেক টাকা দরকার।

—আচ্ছা যেদিন আপনি আজকের টাকা শোধ দিতে আসবেন, সেদিন এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলা যাবে, আজ নয়।

বাড়ী ফিরে আসতেই মা সব শুনে বল্লে—খুব ভদ্দর লোক তো ওরা। আমার দুগাছা বালা আছে, বাঁধা দিয়ে কাজী সাহেবের টাকা দিয়ে আয়।

আমি বল্লাম—বেশ কথা মা।

সেই টাকা ফেরৎ দিতে গিয়ে কাজী সাহেব গোরু কিনবার জন্যে আমায় একশো টাকা ধার দিলেন আবার। আমায় বল্লেন—আজ তেত্রিশ বছর লোককে টাকা আর ধান কর্জ্জ দাদন দিয়ে আসচি, এই আমাদের সাত পুরুষের ব্যবসা! যে মহাজন খাতক চেনে না, সে মহাজন নয়। আপনি টাকা নিয়ে যান, দলিল দিতে হবে না।

এই ভাবে সেই আষাঢ় মাসে ধান রোয়া আমিই নিজের চেষ্টায় শেষ করলাম। বাংলা ১২৮২ সাল। তখন সাড়ে তিন টাকায় উৎকৃষ্ট আমন চাল এক মন পাওয়া যায়, পাকি ওজনের পাওয়া ঘি এই গ্রামে বসেই বারো আনা সের কিনেচি। দুধ ষোল সের টাকায়। সে সব এখন বল্লে রূপকথা বলে মনে হবে।

গ্রামে পীতাম্বর ঘোষ বলে একজন প্রজা ছিল আমাদের। গোরু কেনা সম্বন্ধে তার সঙ্গে পরামর্শ করলাম। সে বল্লে—বাবাঠাকুর, গঙ্গাপারে একটা হাট আছে, সেখানে সস্তায় বলদ পাওয়া যায়। একবার আমি সেখান থেকে গোরু কিনে এনেছিলাম। চলুন সেখানে। আমিও যাবো।

মার সম্মতি নিয়ে পীতাম্বরের সঙ্গে হাঁটাপথে রওনা হলাম। সঙ্গে কাজী সাহেবের দেওয়া সেই একশো টাকা। গেঁজের মধ্যে কাঁচা টাকা নিয়ে কোমরে বেঁধে নিয়েচি পীতাম্বরের পরামর্শে। তখনকার আমলে রাস্তাঘাটে চোরডাকাতের বিশেষ ভয় ছিল, মা পীতাম্বরকে তুলসী গাছ ছুঁইয়ে দিব্যি করিয়ে নিলেন সে যেন আমাকে একা রেখে পথের মধ্যে কোনো দরকারেও কোথাও না যায়।

মা জানতেন না এই যাত্রার কি পরিণাম, কে-ই বা জানতো! আজও ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে যাই এমন একটা ঘটনা একদিন কি করে ঘটেছিল আমার বাইশ বৎসরের জীবনে।

চাঁদুড়ের গঙ্গাতীর আমাদের গ্রাম থেকে সাত ক্রোশ। বেলা দুটোর সময় খেয়ায় গঙ্গা-পার গেলাম। পীতাম্বর বল্লে, বাবাঠাকুর, এখান থেকে ক্রোশচারেক দূরে একখানা গ্রাম আছে, সেখানে আমাদের স্বজাতির বাস আছে অনেক। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হাঁটতে পারবেন?

তখন আমার জোয়ান বয়েস—বল্লাম, খুব।

পীতাম্বর বল্লে—তবে চলুন বাবাঠাকুর।

সন্ধ্যার অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক পরে আমরা সে গ্রামে পৌঁছে গেলাম। ষাট বছর আগের সে সব কথা আজও বেশ মনে আছে আমার। আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে পীতাম্বর বাসার সন্ধানে কোথায় চলে গেল, আমি একটা নিমগাছের তলায় দাঁড়িয়েই আছি অন্ধকারে। পীতাম্বর আর ফেরে না। আধঘণ্টা পরে দেখি পীতাম্বর এসে ডাকচে, আছেন নাকি বাবা-ঠাকুর? চলুন—

তারপর একটা খড়ের ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে তুল্লে। মনে হল সেটা কোন গৃহস্থের বাইরের চণ্ডীমণ্ডপ হবে। একপাশে কতকগুলো বিচালি, অন্যদিকে ধানের বস্তা। একটা মাদুর পর্য্যন্ত পাতা নেই মাটির মেজেতে। তার ওপর অস্পষ্ট অন্ধকার। আলো নেই। বাড়ীর লোকেরা এমন অভদ্র যে একবার খোঁজ পর্য্যন্ত নিলে না আমাদের।

পীতাম্বরকে বল্লাম—দেশলাই জ্বালি, একবার দেখে নিই সাপ-খোপ কোথাও আছে কিনা। এমন বাড়ীতেও নিয়ে এসেছ তুমি।

—বাবু, এ রাঢ় দেশ। বড় খারাপ জায়গা। বিদেশী মানুষকে জায়গা দেয় না। এরা বোধ হয় জানেও না যে আমরা বাইরের ঘরে আছি।

কোনো রকমে রাত কাটিয়ে ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়া গেল দু'জনে। শাঁকমুড়ি বলে একটা ছোট বাজারে চিঁড়ে দই কিনে আমরা ফলার করলাম—আগের রাত্রে অনাহারে আছি, তার ওপর আমার জোয়ান বয়সের খিদে! আধসের করে চিঁড়ে আর আধসের দই, পোয়াটাক গুড় ও এক ছড়া কলা এক একজনে চক্ষের নিমেষে উড়িয়ে দিলাম।

পীতাম্বরের মহৎ দোষ ছিল তামাক খেতে বসলে সে হঠাৎ উঠতো না। মুদীর দোকানে আহারান্তে তামাক খেতে বসলো তো বসলোই। এদিকে বেলা পড়ে আসতে আমি একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

মুদীর দোকানে পয়সা মিটিয়ে আমরা আবার পথ হাঁটি। বেলা যখন বেশ গড়িয়ে এসেচে, তখন উপর দিক থেকে খুব মেঘ করে এল। পীতাম্বর বল্লে—বাবাঠাকুর, আগে সিজে-ডুমুর দ' বলে গ্রাম। অনেক বামুনের বাস। কিন্তু জায়গাটাতে যাবো কিনা তাই ভাবচি—

—কেন?

—বিখ্যাত ডাকাতের জায়গা। বামুনরাই ডাকাত। গঙ্গা দিয়ে একসময় বিদেশী মাল বোঝাই নৌকো যাওয়ার উপায় ছিল না। আজকাল তেমনটা নেই—তবুও বাবাঠাকুর বিশ্বেস নেই। সঙ্গে অতগুলো টাকা।

—গ্রামের মধ্যে ঢোকা ভালো বাইরের মাঠে থাকার চেয়ে। মাঠের মধ্যেও ডাকাতি করে নিতে পারে তো? চলো কোনো ব্রাহ্মণের বাড়ী আশ্রয় নিই।

—কিন্তু বাবাঠাকুর, কোনো রকমে যেন জানতে দেবেন না যে আমাদের কাছে টাকা আছে; সিজে-ডুমুর দ' জায়গা ভালো না।

সন্ধ্যার আগে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে দু'তিনটি ব্রাহ্মণ-বাড়ী গেলাম—কিন্তু কেউ জায়গা দিল না। আমরা বাইরের রোয়াকে শুয়ে থাকতে চাইলাম—রাত্রে কিছু খাবো না বল্লাম, কিন্তু কেউ আমাদের কথায় কর্ণপাত করলে না।

অবশেষে একটা দেউড়িওয়ালা উঁচু পাঁচিল-তোলা পুরোনো আমলের কোঠাবাড়ীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে ভাবচি, এখন কি করা যায়—একজন বৃদ্ধ হঠাৎ দরজা খুলে বাইরে এলেন। আমায় বল্লেন, কে?

—আজ্ঞে, আমাদের বাড়ী এখানে নয়।

—এখানে কি মনে করে?

—বিদেশী লোক, রাত্রে একটু থাকবার জায়গা খুঁজচি।

—তোমরা?

—আজ্ঞে ব্রাহ্মণ।

—কি ব্রাহ্মণ। উপাধি কি?

—রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, উপাধি রায়।

বৃদ্ধ একবার আমার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে বল্লে—এসো বাপু। সঙ্গে কেউ আছে? তাকেও ডাকো।

এভাবে আশ্রয় পেয়ে প্রথমটা খুব খুশী হয়ে উঠেছিলাম বটে কিন্তু পরে সদর দেউড়ি পার হয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে সেই পুরোনো আমলের বাড়ীর চেহারা দেখে কেমন ভয় ভয় হ'ল। নির্জ্জন বাড়ীটায় কেউ যেন কোথাও নেই—এখানে যদি এরা টাকার জন্যে আমাদের খুন ক'রে পুঁতে রাখে, তবে লাস সনাক্ত করবার মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ভেতরে গিয়ে দু'মহল পার হয়ে তৃতীয় মহলে ঢুকে নারীকণ্ঠের স্বর শুনে একটু ভরসা হ'ল। মেয়েদের সামনে খুনটা অন্তত করতে পারবে না। চটাওঠা একটা খুব বড় রোয়াকের একপাশে বর্ষার জলে আগাছা গজিয়ে রীতিমত বন হয়েচে। আমার ভয় হ'ল ওখানে নিশ্চয়ই সাপ লুকিয়ে থাকে। সেই রোয়াকে আমাদের বসবার জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকলো।

পীতাম্বর চাপা গলায় বল্লে—বাবাঠাকুর, এ কি-রকম জায়গা? চলো সরে পড়ি।

আমি ভরসা পেয়েচি মেয়েদের দেখে। বল্লাম—বনেদী গেরস্ত, অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েচে এখন। কোনো ভয় নেই।

একটু পরে বৃদ্ধ ফিরে এসে বল্লে—তোমার সঙ্গের লোকটি কি-জাত? গোয়ালা? বেশ। ওকে এই পেছনের পুকুর থেকে এক ঘড়া জল আনতে হবে, তোমাদের হাত পা ধোবার জন্যে। আমার বাড়ীতে লোকের অভাব।

আমি বল্লাম—যাও পীতাম্বর—

পীতাম্বর দেখি আমায় চোখ টিপচে। আমি ধমক দিয়ে বল্লাম—যাও না—বসে কেন?

অগত্যা সে চলে গেল। আমি একা পড়ে গেলাম অতবড় বাড়ীর মধ্যে। পীতাম্বরের সন্দেহের অর্থ বুঝিনি এমন নির্ব্বোধ নই আমি। খুব সতর্ক হয়ে রইলাম—নিজের দশ হাতের মধ্যে কোনো অপরিচিত লোককে আসতে দিচ্চিনে—কাউকে বিশ্বাস নেই এখানে। প্রসিদ্ধ ডাকাতের জায়গা সিজে-ডুমর দ'।

বৃদ্ধ দেখি আবার আসচে। আমি উঠে দাঁড়ালাম। ওর হাতে লুকোনো সড়কি নেই তো? উঠে দাঁড়ালে তবুও ছুট দিতে পারবো।

বৃদ্ধ বল্লে—দাঁড়িয়ে কেন, বোসো বোসো। তোমাদের বাড়ী কোথায় বল্লে?

—আজ্ঞে সনাতনপুর, নদে' জেলা।

—বাপের নাম কি?

—৺ভূষণচন্দ্র রায়।

—কি কর? বয়স কত? ছেলেমানুষ বলে মনে হচ্চে।

বৃদ্ধ একটা আশ্চর্য্য প্রশ্নও করলে হঠাৎ। বল্লে—গায়ত্রী মন্ত্র বলো তো?

ব্যাপার কি? বৃদ্ধ পাগল টাগল নয় তো? রাত্তিরটা কাটলে বাঁচি।

কি করি, আবৃত্তি করে গেলাম গায়ত্রী।

একটু পরে জল নিয়ে পীতাম্বর ফিরে এল, আমরা হাত পা ধুয়ে বিশ্রাম করলাম। রাত্রের আহারাদিও শেষ হ'ল। আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে টানা বারান্দার একপাশে একটা ঘরে বৃদ্ধ আমার শোয়ার জায়গা দেখিয়ে দিলে।

বিছানায় সবে শুয়েচি। এমন সময় একটি স্ত্রীলোক আমার ঘরে ঢুকলেন। স্ত্রীলোকটির রং বেশ ফর্সা, বয়স চল্লিশের কম নয়, হাতে মোটা সোনার বালা, পরনে রাঙাপাড় শাড়ী। আমার মায়ের বয়সী। দেখে আমি একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম। উঠে বসবার চেষ্টা করলাম বিছানা থেকে।

তিনি বল্লেন—না না থাক, তুমি শোও। বড্ড কষ্ট করে এসেচ, কিছু খাওয়া তো হ'ল না—কিই বা ঘরে আছে?

এমন সময় আবার বৃদ্ধটি ঘরে ঢুকে এমন একটি কথা বল্লেন, যাতে আমি আবার ভাবলাম বৃদ্ধটির মাথা নিশ্চয়ই খারাপ। তিনি স্ত্রীলোকটির দিকে চেয়ে বল্লেন—কেমন, পছন্দ হয়?

স্ত্রীলোকটি বল্লেন—সে কথা এখন কেন! বাছা ঘুমুক। চলো আমরা যাই এখন।

ওঁরা চলে গেলে আমি ভাবলাম, পীতাম্বরকে ডাক দেবো নাকি? কি ব্যাপার এঁদের? নরবলি-টলি দেবে না তো আমায়? পছন্দ কিসের হবে? রাত্রি বোধ হয় কাটলো না।

সকালে পীতাম্বরকে ডাক দিয়ে বল্লাম—চলো সকালেই বেরুনো যাক।

—তা যেমন আপনি বলেন বাবাঠাকুর। একটা কথা বলবো?

—কি?

—কাল আমি শোবার পরে সেই বুড়ো আমার কাছে গিয়ে অনেক খোঁজখবর নিলেন। আপনার বাড়ী কোথায়, কে আছে, অবস্থা কেমন, কিসে চলে—সে অনেক কথা। এ জায়গা ভাল নয়, এখুনি এখান থেকে যাওয়া ভালো।

বৃদ্ধ কিন্তু পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, কাল রাত্রে আমাদের খাওয়া-দাওয়া ভালো হয় নি, আজ এখানে থাকতেই হবে। আমার সঙ্গে তাঁর নাকি একটা কথাও আছে।

—কি কথা?

—আহারাদি ক'রে নাও, ওবেলা হবে এখন সে সব—

বৃদ্ধকে যেন বড় ব্যস্ত বলে মনে হ'ল! বৃদ্ধ পিছন ফিরতেই পীতাম্বর আমায় এসে চুপি চুপি বল্লে—বাবাঠাকুর, বড় বিপদ।

—কি রে?

—এরা ডাকাত। সদর দেউড়ি বন্ধ করে দিয়েচে। টাকার সন্ধান পেয়ে গিয়েচে। বাইরে যেতে দেবে না।

—সত্যি?

—দেখে আসুন নিজের চোখে সদর দেউড়িতে তালা লাগানো।

কথাটি কিন্তু আমার মনে লাগলো না। রাত্রিতে অন্ধকারে এরা যে কাজ অনায়াসে

শেষ করতে পারতো, তার জন্যে দিনমানে দেউড়ি বন্ধ করে গোলমাল বাধাবার চেষ্টা পাবে কেন? পীতাম্বর হাজার হোক গোয়ালার ছেলে, আশি বৎসরে সাবালক হয় না।

রাত্রের সেই স্ত্রীলোকটি একটু পরে এসে বল্লেন—বাবা, কুয়োর জল তুলে দিচ্চি। বেশ করে নেয়ে নাও। কিন্তু এবেলা কিছু খেয়ো না যেন!

আশ্চর্য্য হয়ে বল্লাম—খাব না কেন মা?

এ নিশ্চয়ই নরবলি না হয়ে যায় না!

স্ত্রীলোকটি বল্লেন—মা বলে ডেকেচ তো? তা হ'লেই হয়ে গেল। কর্ত্তার কাছে সব শুনো।

বলতে বলতে বৃদ্ধ এসে হাজির। বল্লেন—সোজা কথা বলি শোনো। আমার একটি নাতনী আছে, সেটিকে তোমায় বিয়ে করতে হবে। সুন্দরী মেয়ে—তোমাকে এখুনি দেখানো হচ্চে। কোনো অনিষ্ট হবে না তোমার। মেয়ে কানা খোঁড়া নয়, দেখলেই বুঝতে পারবে। তোমার সঙ্গে চমৎকার মানাবে বলেই এ সম্বন্ধ স্থির করেছি।

আমার সামনে বজ্রপাত হলেও বোধ হয় তত আশ্চর্য্য হ'তাম না। বিয়ে করতে হবে, সে কেমন কথা!

বল্লাম—সে কি! তা কেমন করে হয়?

—কেন হবে না? তোমরা আমাদেরই পালটি ঘর। মেয়ে ভালো। তোমার অমতের কারণ কি? গহনাপত্র সবই দেওয়া হবে।

—আজ্ঞে তা হয় না।

বৃদ্ধের মুখচোখের ভাব বদলে গেল। হঠাৎ অত্যন্ত কর্কশ ও রুক্ষস্বরে বলে উঠলো—তা হয় না? তা হ'তে হবে। আমি কে জানো? আমার নাম ঈশ্বর রায়। আমার নামে সিঙ্গে-ডুমুর দ' থেকে মগরার খাল পর্য্যন্ত লোকে থরহরি কাঁপতো একদিন। বিয়ে না করে এখান থেকে যাবার জো নেই তোমার। দেউড়িতে চাবি দেওয়া, ঘাড়ে ধরে বিয়ে দেওয়াবো, যদি সোজা আঙুলে ঘি না ওঠে। গোঁপদাড়ি ওঠেনি, ছোকরা কার সঙ্গে কি বলচো তোমার খেয়াল নেই?

আমি কাঠের পুতুলের মত রইলাম। বৃদ্ধ সেই স্ত্রীলোকটির দিকে চেয়ে বল্লে—যাও, জগদ্ধাত্রীকে নিয়ে এসো।

স্ত্রীলোকটি ঘরের মধ্যে ঢুকলেন এবং একটু পরে যখন মেয়েকে নিয়ে এলেন হাত ধরে, তখন সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মতই তার রূপ ফুটে উঠলো আমার মূঢ় চোখের সামনে। যেমনি গড়ন, তেমনি লম্বা, তেমনি রং। নামেও জগদ্ধাত্রী, রূপেও জগদ্ধাত্রী, ব্যবহারেও তাই।

এর পরে গল্প খুবই সংক্ষিপ্ত। এই মেয়েই তোমাদের ঠাকুরমা ৺জগদ্ধাত্রী দেবী। পুণ্যবতী, সিঁথের সিঁদুর নিয়ে চলে গিয়েচে আজ কত কাল, তোমাদের বাপ তখন ছ'বছরের।

আর সেই ডাকাতের সর্দ্দার ঈশ্বর রায় ছিলেন আমার দাদাশ্বশুর।

গল্পটি শেষ করে ঠাকুরদা একবার শ্রোতাদের মুখের দিকে চাইলেন, কিন্তু কারুর মুখ দেখে বোঝা গেল না যে তারা কেউ এটা বিশ্বাস করেচে।

তখন তামাকের নলটায় একটা জোরে টান দিয়ে বল্লেন, আগেই তো বলেচি এটা সত্যি বল্লে তোমরা কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না। কিন্তু জেনো, এটা সত্যি—বুড়ো বয়েসে মিথ্যা কথা বলে নাতিদের ঠকিয়ে আমার লাভ কি বলো!

ভিড়

স্টেশনে আসতে দেরি হয়ে গিয়েছে, টিকিট-ঘরের দিকে চেয়ে হৃৎস্পন্দন বন্ধ হবার উপক্রম হ'ল। তিনবার কুণ্ডলী খেয়ে এক বিরাট কিউ, টিকিটের জানালা থেকে এন্‌কোয়ারি অফিস পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে। ঘড়ির দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে সর্ব্বাগ্রে চট ক'রে সেই কুণ্ডলী-পাকানো অজগর সাপের লেজের আগায় গিয়ে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলাম। নইলে আরও পিছিয়ে পড়তে হবে এক্ষুনি।

তিন মিনিটের মধ্যে লেজটা আরও ছ'হাত বেড়ে গেল।

বহু লোক ব্যাপার দেখে টিকিটের জানালার কাছাকাছি যে সব লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, তাদের কাছে টাকা নিয়ে গিয়ে খোসামোদ করছে,—মশাই, আপনি তো টিকিট করছেনই, এই উলুবেড়ের দু'খানা অমনই ওই সঙ্গে—

—আমার, মশাই, একখানা অমনই কোলাঘাটের—

যাকে অনুনয় করা হচ্ছে সে বলছে,—ওসব হবে না। নিজের নিয়েই ব্যস্ত—না, না, কেন আপনি বকছেন মশাই? যান, তার চেয়ে কিউতে দাঁড়ানো ভাল। লোককে খোশা-মোদ করা ধাতে সয় না।

কিন্তু এদিকে ঘড়িতে এগারোটা বাজে। এগারোটা কুড়িতে নাগপুর প্যাসেঞ্জার ছাড়বে—কুড়ি মিনিটের মধ্যে। সম্মুখে এই বিরাট কিউ। বিশ্বাস তো হয় না।

আরও দশ মিনিট কেটে গেল। কিউ যেমন তেমনই, বিশেষ কোনও উল্লেখযোগ্য পরি-বর্তন অন্তত চর্ম্মচক্ষে তো দৃষ্টিগোচর হয় না, এক-একখানা টিকিট দিতে ছ'মাস লাগছে। এই রেটে আমার পালা আসতে বেলা আড়াইটে বাজবে, এগারোটা কুড়িতে এর সিকির সিকিও ফুরোবে না।

সঙ্গে লটবহর, মেয়েছেলে। নইলে না হয় ফিরেই যেতাম। সারাদিনে আর ট্রেনও নেই।

এই সব ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ হুড়মুড় ক'রে গেল কিউ ভেঙে। দেখি, জনতা ঊর্দ্ধশ্বাসে পাশের জানালার দিকে ছুটছে। কি ব্যাপার, কেউ বলে না। চেয়ে দেখি, এ জানালা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ছুটলাম পাশের জানালার দিকে। সেখানে তখন ঠেসাঠেসি, ধাক্কাধাক্কি

ও হাতাহাতি চলেছে। পূর্ব্বতন কিউয়ের লেজের দিকে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারাই এখন নতুন কিউয়ের পুরোভাগে আসবার প্রয়াসী।

একজন বলছে,—তুমার জায়গা এখানে ছিল? খবরদার—

—খবরদার—

—মু' সামালকে বাত বোলো—

—এই ব্যাটা, দেখবি?

মুহূর্ত্তমধ্যে বিশৃঙ্খলা, কিলোকিলি। অকথ্য ভাষণের বন্যা ব'য়ে গেল উভয় পক্ষে।

আমি অতি কষ্টে প্রাণপণে জন আষ্টেক লোকের পেছনে জায়গা দখল করেছিলাম। মিনিট দশেক পরে যখন টিকিটের জানালার কাছে আসবার পালা এল, তখন আমার গন্তব্য স্থানের কথা শুনেই মেমসাহেব বললে, নট হিয়ার, নম্বর টোয়েন্টি।

সে আবার কোথায়? নাঃ, ট্রেন পাওয়া যাবে না দেখছি। আর সময় নেই। যদি বা অতি কষ্টে একটু জায়গা করলাম, তাও কোন কাজে এল না। খুঁজে খুঁজে কুড়ি নম্বরের জানালা বার করলাম, সেখানেও কিউ, তবে অত লম্বা নয়। একজন বললে,—মশাই, কোথায় যাবেন? আমায় দয়া ক'রে একখানা খড়্গপুরের—

মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছে। রূঢ়স্বরে বললাম,—কেন বিরক্ত কর বাপু?

মেমসাহেবকে নোট বার ক'রে দিতেই ছুঁড়ে ফেলে দিলে,—নো চেঞ্জ, ভাগো।

তটস্থ ও কাঁচুমাচু হয়ে বলি, ইয়েস ম্যাডাম, সরি ম্যাডাম, হিয়ার মাই চেঞ্জ ম্যাডাম।

পকেট হাতড়ে দশ আনা পয়সা বার করবার পথ খুঁজে পাই না।

কনুইয়ের কাছে একটি সানুনয় অনুরোধ আমায় বাবু, একখানা মেচেদার টিকিট যদি ক'রে দেন, ছোট ছেলে সঙ্গে রয়েছে, ভিড়ে ঢুকতে পারছি না, দু'বার গেনু—

মাথা তখন সম্পূর্ণ বেঠিক। বলি,—ভাগো।

—বাবু, দেন একখানা। দু'বার গেনু—

—নেই হোগা, ভাগো। রাগের মাথায় হিন্দি বেরিয়ে পড়ে।

টিকিট-কাটা পর্ব্ব সাঙ্গ ক'রে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটি গাড়ী ধরতে। মেয়েদের গাড়ীতে জিনিসপত্র তুলে দিলাম, কারণ চেয়ে দেখে মনে হ'ল অতি কষ্টে নিজে উঠতে পারব কি না সন্দেহ।

অসম্ভব ভিড় প্রত্যেক গাড়ীতে। তার ওপর মানুষ কেমন যেন হৃদয়হীন, রূঢ়, পশুবৎ হয়ে উঠেছে, এরা নিজের নিজের জিনিস, নিজের নিজের বসবার জায়গা সামলাতে ভীষণ ব্যস্ত ও অত্যধিক সতর্ক। এই রেলেই কতবার ভ্রমণ করেছি, মানুষের মধ্যে কত সহানুভূতি কত মমত্ব দেখেছি। এখন এই বিপদের চাপে মানুষ রূঢ় কঠোর হয়ে উঠেছে। একবার মনে আছে,—সম্পূর্ণ অপরিচিতা এক ভদ্রমহিলা আমাকে তাঁদের খাবার ঝুড়ি থেকে খাবার বের ক'রে ডিশে সাজিয়ে তাঁর স্বামীর হাত দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। ভদ্রলোক আমার সামনে ডিশ রেখে বিনীতভাবে বললেন, একটু জলযোগ করুন।

আমি চমকে উঠলাম। হাওড়া থেকে একসঙ্গে ইণ্টার ক্লাসে যাচ্ছি পাশাপাশি বেঞ্চিতে,

অথচ একটা কথা বিনিময় হয় নি তাঁদের সঙ্গে আমার। জলখাবার দেওয়ার ব্যাপার ঘটল পরদিন সকালে কিউল স্টেশনে।

সঙ্কোচের সঙ্গে বললাম,—না না, এ কেন, আমি—আপনারা খান।

—না, সে শুনব না, খেতেই হবে। এ সব স্টেশনে খাবার পাওয়া যায় না, অনেক খাবার আছে আমাদের সঙ্গে, দয়া ক'রে একটু মুখে দিন।

কোথায় গেল সে সব দিন! এখন একখানা কচুরির মত তিন ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট পুরির দাম এক আনা। মানুষের ভ্রাতৃভাব কোথায় উবে গিয়েছে।

ট্রেনের জানালার বাইরে ভিখারীর ভিড়। একজন শীর্ণকায় স্ত্রীলোক, কোলে তার একটি ছেলে, ইনিয়ে বিনিয়ে বলছে,—বাবু, তোমরা থাকতে আমরা ডুবে যাব! সমস্ত দিন খাই নি, দুটো পয়সা দেন।

একজন উত্তর দিলে,—কোথা থেকে দোব বাপু। চল্লিশ টাকা চালের মণ, এবার সবাই ডুববে, যাও, হবে না।

একটি রোগা হ্যাংলা গোছের লোক ময়লা পৈতে বার ক'রে ভিক্ষে করছে। কামরার ও-প্রান্ত থেকে সে সুর ক'রে প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করতে করতে আসছে শুনছি। তার নাকি অনেক কষ্ট, বাড়ীতে বৃদ্ধা মাতা শয্যাগত, স্ত্রীপুত্র অনাহারে মরছে। যত কাছে আসে, ততই দেখলাম নিজের মনে রাগ ও বিরক্তি জমে' উঠছে। কাছে এলে মুখ খিঁচিয়ে বলি, ইদিকে আর কোথায় আসছ? দেখছো ভিড়ের ঠ্যালা! না পাব কোথাও খুচরো যে তোমায় দোব! খুচরোর অভাবে বলে চা খেতে পাই নি—

গাড়ীর ভিড় ক্রমশই বাড়ছে ব'লে সবাই গাড়ীর দোর ঠেলে বন্ধ ক'রে রেখেছে, কাউকে উঠতে দেবে না। জানালা গলিয়ে জোরজবরদস্তি ক'রে লোক উঠে প'ড়ে দফায় দফায় মারামারির সৃষ্টি করছে।

—মশাই, একটু সরে' বসুন না!

—কোথায় সরে' বসব, দেখুন। বাঃ, ঘাড়ে এসে বসলেন যে!

—আপনি যে এতটা জায়গা জুড়ে ব'সে থাকবেন! দেখছেন না ভিড়!

—তাই ব'লে আপনি ঘাড়ের ওপর এসে বসবেন? খুব ভদ্দরলোক তো?

—ভদ্দরলোক তুলে কথা বলবেন না, সাবধান ক'রে দিচ্ছি।

—ওঃ, কেন? নবাব খান্‌জা খাঁ নাকি? কিসের ভয়? তোমার এক চালায় বাস করি?

—খবরদার! মুখ সামলে। 'তুমি' 'তুমি' করবে না বলছি। একটা চড়ে—

অতঃপর বিরাট কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি। এক পক্ষে ভাঙা ছাতা, অপর পক্ষে মুষ্টিবদ্ধ হস্ত। গাড়ীর লোকে 'হাঁ' 'হাঁ' ক'রে উভয়ের মধ্যে এসে প'ড়ে তাদের ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। চলল নানাবিধ সদুপদেশ।—এই সামান্যক্ষণ গাড়ীতে থাকা, তার জন্যে কেন ঝগড়া করা? বলি, এই আঁচুল থেকেই তো লোক নামতে শুরু হবে।

গাড়ী চলেছে। কলকারখানা, লোকের ঘরবাড়ী, ধানের ক্ষেত। প্রত্যেক স্টেশনে লোকে কামরার বাইরের হ্যাণ্ডেল ধ'রে ঝুলছে, প্রায়ই নাকি দু-একটা প'ড়ে গিয়ে মারাও যাচ্ছে। নতুন নতুন স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে কি ভীষণ ভিড়, এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত লোকজন, মেয়েছেলে, ট্রাঙ্ক, বোঁচকা, পুঁটলি, গুড়ের ভাঁড়, চোরাই চালের বস্তা, ছাতি, লাঠি নিয়ে অধীর ব্যস্ততার সঙ্গে ছুটোছুটি করছে, যে ক'রে হোক গাড়ীতে উঠতেই হবে তাদের।

আমাদের কামরায় যত লোক ব'সে আছে, তার দু'গুণ দাঁড়িয়ে রয়েছে। যারা ঢুকতে আসছে, তাদের সকলকেই বলা হচ্ছে,—আগে যাও, আগের গাড়ী খালি।

সে স্তোকবাক্যে কেউ ভুলে আগে দেখতে যাচ্ছে, কেউ না ভুলে বলছে, কোথায় খালি বাবু, দেখে আসুন পিঁপড়ে ঢোকানোর জায়গা নেই কোনও গাড়ীতে, দেন একটু খুলে, দিনেরাতে এই একখানা গাড়ী।

এক দাড়িওয়ালা শিখ আমাদের দ্বারপাল। সে হুঙ্কার দিয়ে বলছে,—আগাড়িওয়ালা ডাব্বামে চলা যাও।

ইতিমধ্যে ওপরের তাক থেকে এক লুঙি-পরা গোঁপছাঁটা মুসলমান পা ঝুলিয়ে নীচের বেঞ্চিতে নামবার চেষ্টা করলে দু-একবার, ভিড়ের জন্যে কৃতকার্য্য হ'ল না, শেষ পর্য্যন্ত একজনের প্রায় ঘাড়ে পা দিয়েই নামল। লম্বা, রোগামত লোকটা, মুখখানাতে যেন বদমাইশি মাখানো। ওকে দেখে আজকের এই সমস্ত কলহ-কোলাহল-নির্ম্মমতার প্রতীক ব'লে যেন মনে হ'ল। বিড়ির ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার ক'রে দিব্যি সে চেপে বসল সামনের বেঞ্চিতে।

কামরার মধ্যে অন্য কোন কথাই নেই, কেবল—

—মশাই আপনাদের ইদিকে চাল কি দর?

—চল্লিশ টাকা। আপনাদের?

—আমাদের সাড়ে বত্রিশ দেখে এসেছি।

—সে কোন্ জায়গা?

—ওই দক্ষিণে—ডায়মণ্ডহারবার।

—মানুষ এবার না খেয়ে ম'রে যাবে মশাই।

ডায়মণ্ডহারবারবাসী লোকটি বললে,—ম'রে যাবে কি মশাই, মরে যাচ্ছে। আমাদের ওদিকে একদিন কতকগুলো গরীব লোকের মেয়েছেলে এসে বললে, তোমাদের বনের কচু সব তুলে নিয়ে যাব, আর কচি জামরুলপাতা।

কে একজন জিজ্ঞেস করলে,—জামরুলপাতা আবার খায় নাকি?

—খায় না? গিয়ে দেখুন, আমাদের দেশে জামরুলগাছের আর পাতা নেই, সব সাবাড় করেছে।

আর একজন বললে,—এই তো আজও দুটো ভিখিরি শেয়ালদার কাছে ফুটপাথে ম'রে

প'ড়ে ছিল সকালবেলা।

—আজ নতুন দেখলেন আপনি? ও দুটো-পাঁচটা রোজ মরছে। কাল বৈঠকখানার বাজারে কণ্ট্রোলের চালের কিউতে এক বুড়ী ধুঁকতে ধুঁকতে মারা গেল, আমাদের দোকানের সামনে।

—কিসের দোকান আপনাদের?

—কাপড়কাচা সাবান। আমি এই ইষ্টিশানে নামব, পুঁটুলিটা ছেড়ে দেন।—চিঁড়ে, তাই দু'টাকা সের।

মনে পড়ল, আমাদের দেশের হাটে সদ্‌গোপ মেয়েরা চিঁড়ে বিক্রি করত, দু'আনা সের, চিরকাল দেখে এসেছি। চার আনা সেরের মুড়কি খুব ভাল মুড়কি ছিল। আর সে সব দিন ফিরবে কখনও?

কি একটা স্টেশনে এসে গাড়ী দাঁড়াল। শিখ দাঁড়িয়ে উঠল, দরজা ঠেলে বন্ধ ক'রে যাত্রী-দের রুখতে হবে। আবার একদফা হৈ-হৈ চীৎকার, গালাগালি, অনুনয়-বিনয় ও হুঙ্কারের পালা শুরু হ'ল। একটা কচি ছেলের চীৎকার প্ল্যাটফর্মের বাইরে। একজন লোক জানালা দিয়ে গ'লে আসবার প্রাণপণ চেষ্টা করাতে গাড়ীর লোকে তাকে ধাক্কা মেরে নামিয়ে দিয়ে জানালা বন্ধ ক'রে দিলে। মনে হ'ল, বেশ হয়েছে, ওঠ জানালা দিয়ে!

মন নিষ্ঠুর নির্মম হয়ে উঠেছে বিপদের মুখে প'ড়ে। অন্য কারও সুবিধা-অসুবিধা সে এখন বুঝতে রাজি নয়!

একটা স্টেশনে দেখা গেল, চারিদিকে থৈ-থৈ করছে জল। বললাম,—এটা কি বন্যে নাকি?

একজন বললে,—কাঁসাই নদীর বন্যে। কত ধান যে ডুবে গিয়েছে, দু'খানা গাঁ একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে মশাই।

শিখ দ্বারপাল বললে,—নেই হোগা, আগাড়িওয়ালা ডাব্বা একদম খালি, যাও আগাড়ি।

আর একজন বললে,—ভাসিয়ে নিয়ে যাবে না মশাই? চেতাবুনিতে যে লিখেছিল—

কোণ থেকে কে ব'লে উঠল,—বাদ দিন চেতাবুনি! জোচ্চোর কোথাকার—

অর্থাৎ লোকটা চেতাবুনিতে কথিত প্রলয় দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়েছে।

এইবার সেই লুঙি-পরা লোকটি ন'ড়েচ'ড়ে ব'সে বললে—বাবু, আমাদের নন্দিগ্রাম থানায় এমন এক জ্বর দেখা দিয়েছে, যার হচ্ছে, তিন দিন চার দিন পরে মারা পড়ছে। আর বছর হ'ল আশ্বিনে ঝড়, এ বছর বন্যে আর তার সঙ্গে এই জ্বর। আমার মশাই বাইশ বছরের ছেলে—

ব'লেই, কোথাও কিছু নেই, লোকটা হাউমাউ ক'রে কেঁদে উঠল।

—কি হয়েছে ছেলের?

—আর কি হবে বাবু, নেই। সেই খবর পেয়েই তো দেশে যাচ্ছি। কলকাতায়

কলে চাকরি করি, আর-বছর ঘরদোর ঝড়ে সব প'ড়ে গেল, আবার এ বছর বাইশ বছরের ছেলেটা—

আবার সে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল। গাড়ীসুদ্ধ লোকের গোলমাল যেন মন্ত্রবলে স্তব্ধ হয়ে গেল। শিখ দ্বারপাল তার হুঙ্কার থামিয়েছে। কাছাকাছি দু-একজন লোক সান্ত্বনা দেবার কথা বলতে লাগল। কি অসহায় ওর কান্না!

—কেঁদো না ভাই, কি করবে কেঁদে, আহা, বাইশ বছরের ছেলে। বাঁচা-মরা কারও হাতে নয় দাদা। নাও, বিড়িটা ধরাও।

ওই একটি পুত্রবিয়োগাতুর পিতার ক্রন্দনে গাড়ীর আবহাওয়া যেন বদলে গেল এক মুহূর্ত্তে। সূচ্যগ্রপরিমাণ স্থানের জন্যে যে নির্লজ্জ চেষ্টা ও আঁকড়ে থাকবার আগ্রহ, তা বন্ধ হয়ে গেল।

—স'রে আসুন না, এদিকে জায়গা আছে।

একটা ছোট ছেলে অনেকক্ষণ থেকে একটা নারকেল তেলের বোতল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, এতক্ষণ পরে একজন কে তাকে হাত ধ'রে বললে,—বাবা, এখানে ব'স কোনও রকমে, হয়ে যাবে এখন।

যে লুঙি-পরা লোকটিকে এতক্ষণ আমি গুণ্ডার সর্দ্দার ব'লে ভাবছিলাম, তার মুখের দিকে চেয়ে কেমন একটা করুণা ও সহানুভূতির উদ্রেক হ'ল। হতভাগ্য পিতা, হয়তো ওর বৃদ্ধ বয়সের সম্বল হয়ে দাঁড়াত এই পুত্রটি, হয়তো ওর একমাত্র পুত্র। গাড়ীর আবহাওয়া ওর কান্নার সুরে কি আশ্চর্য্যভাবেই বদলে গিয়েছে। এই নির্ম্মমতা, নিষ্ঠুরতা, উগ্র স্বার্থবোধ, যা হাওড়া থেকে উঠে পর্য্যন্ত সমানে দেখে আসছি, যাতে শুধু মানুষের পশুত্বের ছবিটাই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল চোখের সামনে, ওই লুঙি-পরা লোকটির চোখের জলে সব যেন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল। মানুষের লজ্জা হ'ল মানবতার অপমানে যেন। যেন সবাই সতর্ক হয়ে উঠল।

এইবার যে স্টেশনে গাড়ী এসে দাঁড়াল, সেখানে লোকটি নেমে যাবে। গাড়ীর এক কোণে একটি দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ ব'সে ছিল, সে আবেগভরে বললে,—এখানে নামবে? আচ্ছা বাবা, ভগবান তোমার মনে শান্তি দিন, আমি বুড়ো বামুন, আশীর্ব্বাদ করছি, ভালো হবে তোমার, ভালো হবে!

আরক

লাহোর মিউজিয়মে যখন চাকরী করতাম সে সময় লাহোরের বিখ্যাত 'দেশ-বন্ধু' কাগজের সম্পাদক বিনায়ক দত্ত সিং মহাশয়ের সঙ্গে আমার যথেষ্ট আলাপ হয়। মিঃ সিংহ প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, তাঁদের আদি বাসভূমি পাঞ্জাবে নয়, রাজপুতানার কোটা রাজ্যে।

তিনপুরুষ পূর্ব্বে তাঁর পিতামহ রাজকার্য্য উপলক্ষ্যে এসে পাঞ্জাবে বাস করেন, সেই থেকেই তাঁরা দেশছাড়া। সন্ধ্যার পরে তাঁর বৈঠকখানায় গিয়ে বসতাম এবং দেওয়ালে টাঙানো পুরানো আমলের বর্ম্ম, কুঠার, পতাকা, বল্লম প্রভৃতি রাজপুতের যুদ্ধাস্ত্র সম্বন্ধে নানা ইতিহাস ও আলোচনা শুনতে বড় ভালো লাগতো। রাজপুতানার, বিশেষ করে কোটা রাজ্যের ইতিহাস সম্বন্ধে মিঃ সিংয়ের জ্ঞান খুবই গভীর।

কিন্তু এ-সকল কথা নয়। আমি একটা আশ্চর্য্য ঘটনা বলবো। মিঃ বিনায়ক দত্ত সিংয়ের মত সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোকের মুখে না শুনলে আমিও এ কাহিনী হেসে উড়িয়ে দিতাম।

একদিন শীতকালে সন্ধ্যার পরে আমি মিঃ সিংয়ের বৈঠকখানায় গিয়ে বসেচি। ভীষণ শীত সেদিন। দু'পেয়ালা গরম চা পানের পর তাওয়ার তামাক টানচি (মিঃ সিং ধূমপানে অভ্যস্ত নন)। হঠাৎ কি মনে করে জানিনে, আমি তাঁকে বল্লাম—মিঃ সিং, আপনি অপ-দেবতায় বিশ্বাস করেন ?

মিঃ সিং একটু চিন্তা করে বল্লেন—হ্যাঁ, করি।

—দেখেচেন ভূতটুত ?

মিঃ সিং গম্ভীর স্বরে বল্লেন—না, এ আমার কথা নয়। আমার ছোট ঠাকুরদাদার জীবনের ঘটনা। যদি এ ঘটনা না ঘটতো আমাদের বংশে, তবে আজও আমরা কোটা রাজ্যে মস্ত বড় খানদানি তালুকদার হয়ে থাকতে পারতাম। লাহোরে এসে চাকরি করতে হ'ত না। সে বড় আশ্চর্য্য ঘটনা।

আমি বল্লাম—কি রকম ?

—শুনুন তবে। আমার ছোট ঠাকুরদা আমার পিতামহের আপন ভাই নন, বৈমাত্র ভাই। তিনি মস্ত বড় সৌখীন মানুষ ছিলেন— আর ছিলেন খুব সুপুরুষ।

আমি বিনায়ক দত্ত সিংয়ের দীর্ঘ, গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠ দেহের দিকে চেয়ে সে কথা অবিশ্বাস করতে পারলাম না।

তারপর তিনি বলে যেতে লাগলেন—আমি যখন তাঁকে দেখেচি, তখন আমার বয়স খুব কম। কিন্তু তিনি তখন বদ্ধ উন্মাদ !—এক দম। কেন তিনি উন্মাদ হ'লেন, সেই ইতিহাসের মূলেই এই গল্প। তিনি উন্মাদ হওয়াতে কোটা রাজদরবারের আইন অনুসারে তাঁর ভাগের সমস্ত সম্পত্তি আমাদের হাতছাড়া—সে কথা যাক্ গে। আসল গল্পটা বলি—

বিনায়ক দত্ত সিং তাঁর অনবদ্য ঊর্দ্দুতে সমস্ত গল্পটা বলে গেলেন। মধ্যে মধ্যে আমি তাঁকে নানা প্রশ্ন করেছিলুম, সে সব বাদ দিয়ে শুধু গল্পটাই আমার নিজের ভাষায় প্রকাশ করলাম।

আমাদের গ্রাম থেকে কিছুদূরে কোটা দরবারের একটা সৈন্যদের আড্ডা ছিল। আমার ঠাকুরদাদা সেই সৈন্যদের আড্ডায় মাঝে মাঝে যেতেন—মদ খেয়ে ফূর্ত্তি করতে। তাঁর দু'একজন বন্ধু সেখানে ছিল, তাদের সঙ্গের নেশাতেই সেখানে যাওয়া! একবার জ্যোৎস্নারাত্রে তিনি আর তাঁর দুই বন্ধু খেয়ালের মাথায় বরী নদীতে স্নান করতে যাবেন বলে ঘোড়ায় করে বেরুলেন।

বরী নদী মরুভূমির মধ্য দিয়ে তিন শাখায় ভাগ হয়ে সাবলীল গতিতে বয়ে গিয়েচে। যে সময়ের কথা বলা হচ্চে তখন এই ত্রিস্রোতা নদীর প্রথম ধারাটিতে আদৌ জল ছিল না, মাঝের শাখাটিতে হাঁটুখানেক জল—তারপর মাইলটাক বিস্তৃত চড়া—তার ওপারে আসল ধারা, অনেকখানি জল তা'তে।

যাবার পথে একজন বন্ধুর কি খেয়াল হ'ল তিনি প্রথম ধারার বালির ওপর ঘোড়া থেকে নেমে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লেন—আর কিছুতেই উঠতে চাইলেন না। বাকি বন্ধুটি আর আমার ঠাকুরদাদা অগত্যা তাকে সেখানেই বালুশয্যার শায়িত অবস্থায় ফেলে চল্লেন এগিয়ে। বলা বাহুল্য, তিনজনের মধ্যে কেউই ঠিক প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিলেন না।

আমার ঠাকুরদাদা বড় ধারা অর্থাৎ আসল বরী নদীর কাছে এসে পেছন ফিরে চেয়ে দেখলেন তাঁর বন্ধুটি ঘোড়া থামিয়ে বালির চড়ার পশ্চিম দিকে ভীত ও বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। ঠাকুরদাদা বল্লেন—ওদিকে কি দেখচ চেয়ে?

বন্ধু মুখে কিছু না বলে সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখালে আর ইঙ্গিতে ঠাকুরদাদাকে চুপ করে থাকতে বল্লে। ঠাকুরদাদা চেয়ে দেখলেন, বালুর চরার ঠিক মাঝখানে অস্পষ্ট ধরণের কতকগুলি মনুষ্যমূর্ত্তি—চক্রাকারে ঘুরচে! কিছুক্ষণ চেয়ে দেখে মনে হ'ল ওরা যেই হোক্, হাত ধরাধরি করে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করচে। সেই নির্জ্জন স্থানে রাত্রিকালে কাদের এমন আমোদ লেগেচে যে লোকচলাচলের অন্তরালে নৃত্য করতে যাবে বুঝতে না পেরে তাঁরা দু'-জনেই অবাক হয়ে রইলেন। কাছে কেউ কেন গেলেন না, সে কথা আমি বলতে পারব না, কারণ, শুনি নি। হয়তো এদের মত্ত অবস্থাই সব দৃশ্যটার জন্য দায়ী, এই ভেবে তাঁরাও কাউকে কথাটা বলেনওনি সেই সময়।

এর পরে আরও বছর তিনেক কেটে গেল।

ত্রিস্রোতা বরী নদীর প্রধান স্রোতোধারার তিন মাইল উত্তরে মরুভূমির মধ্যে একটা বড় লবণাক্ত জলের হ্রদ আছে, এর নাম 'নাহারা নিপট' অর্থাৎ ব্যাঘ্র হ্রদ। এই হ্রদের দূরে দূরে এ'কে প্রায় চারিদিক থেকে বেষ্টন করে পাহাড়শ্রেণী—এই পাহাড়শ্রেণী কোথাও হাজার ফুট উঁচু, কোথাও তার চেয়ে বেশী উঁচু। হ্রদ ও পাহাড় থেকে খনিজ লবণ পাওয়া যায় বলে কোটা দরবার থেকে মাঝে মাঝে এর ইজারা দেওয়া হ'ত ব্যবসাদারদের।

আমার ঠাকুরদাদা পূর্ব্বোক্ত ঘটনার প্রায় তিন বছর পরে একদিন এই হ্রদের জলে বালি-হাঁস শিকার করতে যাবেন ঠিক করলেন। গভীর রাত্রে বালি-হাঁসের দল হ্রদের জলে দলে দলে চরে' বেড়ায়, একথা তিনি শুনেছিলেন। একটা ঘাসের লতাপাতার ছোট ঝুপড়ি বেঁধে তিনি তার মধ্যে লুকিয়ে থাকবেন দিনমান থেকে—কারণ মানুষ দেখলে হাঁসের দল আর নামবে না।

সব ঠিকঠাক হ'ল, কিন্তু দু'একজন বৃদ্ধলোক নিষেধ করলে, রাত্রিকালে নাহারা হ্রদের ত্রিসীমানাতেও যাওয়া উচিত নয়। কেন, তারা স্পষ্ট করে কিছু বল্লে না—শুধু বল্লে জায়গাটা ভালো নয়। ভৈজি নামে একজন বৃদ্ধ ভীল আমাদের প্রজা ছিল, সে বল্লে,—কোটা দরবারের নিমক মহালের ইজারাদার এক বেনিয়ার সে চাকর ছিল তার যৌবন বয়সে। উক্ত বেনিয়ার

লবণের গুদাম আর আড়ৎ ছিল নাহারা হ্রদের পাড় থেকে মাইল খানেক দূরে পাহাড়ের কোলে। সে সময় সে দেখেচে হ্রদের ওপর আকাশ হঠাৎ গভীর রাত্রে যেন দিনের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠলো—কেমন যেন অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে হ্রদের জলে। মোটের উপর রাত্রে হ্রদের ধারে কেউ যায় না—অনেক দিন থেকেই স্থানীয় লোকেদের মধ্যে এ ভয় রয়েচে। একবার এক মেষপালক রাত্রিকালে হ্রদের ধারে কাটিয়েছিল, সকালবেলা তাকে সম্পূর্ণ উন্মাদ অবস্থায় নিমকের গুদামের কাছে পায়চারি করতে দেখা যায়।

আমার ঠাকুরদাদা এসব গালগল্প শুনবার লোক ছিলেন না। তিনি বুঝতেন স্ফূর্ত্তি, শিকার, হল্লা, হৈ-চৈ। লোকটাও ছিলেন দুঃসাহসী ও একগুঁয়ে ধরণের। তিনি যাবেনই ঠিক করলেন।

বৃদ্ধ ভীল তাঁকে বল্লে—হুজুর, হাঁসের দল যদি জলে নামে, তবে সেরাত্রে কোনো ভয় নেই জানবেন! ঠাকুরদাদা জিজ্ঞেস করলেন—কিসের ভয়? বাঘের?

—তার চেয়েও ভয়ানক কোনো জানোয়ার হতে পারে—কি জানি হুজুর, আমার শোনা কথা মাত্র। ঠিক বলতে পারিনে—

—তুই সঙ্গে থাক না? বকশিশ দেবো—

—মাপ করবেন, হুজুর। একশো রূপেয়া দিলেও না, রাত কাটাবে কে নাহারা নিপটের ধারে? প্রাণের ভয় নেই? আমরা ভীল, বাঘের ভয় রাখি নে—এই হাতে তীর দিয়ে কত বাঘ মেরেচি, কিন্তু হুজুর, বাঘের চেয়েও ভয়ানক কোনো জীব কি দুনিয়ায় নেই?

আমার ঠাকুরদাদা নাহারা হ্রদ ভালো জানতেন না। ঠিক আমাদের অঞ্চলে হ্রদটা নয়, আমাদের গ্রাম থেকে চল্লিশ মাইল দূরে। তখনই তিনি ভীলদের গ্রাম থেকে রওনা হয়ে সাত আট মাইল হেঁটে পাহাড় ডিঙিয়ে সমতল ভূমিতে নামালেন, দূরে মস্ত বড় হ্রদটার লবণাক্ত জলরাশি প্রখর সূর্য্যতাপে চক্ চক্ করচে। জনপ্রাণী নাই কোনো দিকে।

বেলা তখনও অনেকখানি আছে, এমন সময়ে ঠাকুরদাদা হ্রদের ধারে পৌঁছে গেলেন এবং নলখাগড়া ও শুকনো ঘাস দিয়ে সামান্য একটু আবরণ মত তৈরি করে নিলেন জলের ধারেই, যার আড়ালে তিনি বন্দুক নিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারেন, হাঁসের দল তাঁকে না টের পায়।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল—রাঙা রোদ দূরের পাহাড়ের গা থেকে মিলিয়ে গিয়েচে অনেকক্ষণ। সুন্দর চাঁদ উঠলো পূবের পাহাড় ডিঙ্গিয়ে, কৃষ্ণপক্ষের আঁধার রাত্রি। একদল সবুজ বনটিয়া জলের ধারে নেমে আবার উড়ে গেল।

নির্জ্জন নিস্তব্ধ মরুভূমি আর হ্রদ।

দুই দণ্ড পরে জ্যোৎস্না ফুটে উঠলো হ্রদের বুকে। ধবধবে জ্যোৎস্না—কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার। দুদিন মাত্র আগে হেমন্তপূর্ণিমা চলে গিয়েচে—যত রাত বাড়ে, তত শীত নামে।

শীতের মুখে বালি-হাঁস আসবার সময়—কিন্তু কই একটা হাঁসও আজ নামচে না কেন?

বৃদ্ধ ভীলের কথা মনে পড়লো ঠাকুরদাদার। হাঁসের দল যদি নামে তবে সে-রাত্রি বিপদহীন বলে জানবেন।—যদি না নামে তবে কিসের বিপদ? বাঘ জল খেতে আসে পাহাড় থেকে?

রাত্রি ক্রমে গভীর হ'ল। অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নালোকে হ্রদের জল, মরুভূমির নোনা বালি

রহস্যময় হয়ে উঠেচে—কোনো শব্দ নেই কোনো দিকে। ঠাকুরদাদা যথেষ্ট দুঃসাহসী হ'লেও তাঁর যেন গা ছমছম্ করে উঠলো—জ্যোৎস্নার সে ছন্নছাড়া অপার্থিব রূপে। তিনি চামড়ার বোতল বের করে কিছু আরক সেবন করলেন।

হঠাৎ হ্রদের তীরের পশ্চিমাংশে চেয়ে দেখে তাঁর মন আনন্দে দুলে উঠলো। জ্যোৎস্নালোকেও আকাশের নীচে একদল বালি-হাঁস নামচে। জ্যোৎস্না পড়ে তাদের সাদা দুধের মত পাখাগুলো কি অদ্ভুত দেখাচ্চে! দেখতে দেখতে তারা নেমে এসে হ্রদের ধারে বালির চরে বসলো।

জায়গাটা ঠাকুরদাদার ঝুপড়ি থেকে দু'শো গজের মধ্যে কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশি।

এতদূর থেকে বন্দুকের পাল্লা পাবে না, বিশেষ এই জ্যোৎস্নারাত্রে। ঠাকুরদাদা ভাবলেন, দেখি ওরা কাছে আসে কিনা, বা আরও হাঁসের দল নামে কিনা। শিকারীর পক্ষে ধৈর্য্যের মত গুণ আর কিছু নেই। একদৃষ্টে হাঁসগুলোকে লক্ষ্য করাই ভালো। কিন্তু পরক্ষণেই ঠাকুরদাদা বিস্ময়ে নিজের চোখ বার বার মুছলেন। আরক খেয়েচেন বটে, কিন্তু তাতে জ্ঞানহারা হবার বা চোখে অত ভুল দেখবার কি কারণ আছে এখনই?

অতঃপর যা ঘটল তা বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছা মিষ্টার ব্যানার্জ্জি, কিন্তু এ গল্প আমি বাবার মুখে অনেকবার শুনেচি—আমাদের বংশের ঘটনা—কাজেই আমি আপনাকে মিথ্যে বলচি বানিয়ে, অন্তত এইটুকু ভাববেন না। ঠাকুরদাদা দেখলেন, সেই হাঁসগুলো সাধারণ হাঁসের মত নয়—অনেক বড়। অনেক—অনেক বড়। হাঁসের মত তাদের চালচলন নয়। তার পরেই মনে হ'ল সেগুলো হাঁসই নয় আদপে। সেগুলো মানুষের মত চেহারা বিশিষ্ট। বেচারী ঠাকুরদাদা আবার চোখ মুছলেন। আরক ঐটুকু খেয়েই আজ আবার এ কি দশা। পরক্ষণেই সেই জীবগুলি জলে নামল এবং হাঁসের মত সাঁতার দিয়ে, তিনি যেখানে লুকিয়ে আছেন, তার কাছাকাছি জলে এসে গেল। কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নাতে বিস্মিত, ভীত চকিত, দুঃসাহসী, আরক-সেবনকারী ঠাকুরদাদা দেখলেন, তারা সত্যিই হাঁস নয়—একদল অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ে! শুভ্র তাদের বেশ—জ্যোৎস্না পড়ে চিক্‌চিক্ করচে; তাদের হাসি, মুখশ্রী সবই অতি অদ্ভুত ধরণের সুন্দর। কতক্ষণ ধরে তারা নিজেদের মধ্যে খেলা করলে জলে, রাজহংসের মত সুঠাম ধরণে, নিঃশব্দে, সুন্দর ভঙ্গিতে হ্রদের বুকে সাঁতার দিতে লাগলো। তারপর কতক্ষণ পরে—তা ঠাকুরদাদার আন্দাজ ছিল না—কারণ, তখন ঠাকুরদাদা সময়ের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেচেন—ওরা সবাই জল থেকে উঠলো এবং অল্পপরেই জ্যোৎস্নাভরা আকাশ দিয়ে ভেসে হাঁসের মতই শুভ্র পাখা নেড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। —হ্রদের তীরের বাতাস তখনও তাদের অপূর্ব্ব দেহগন্ধে ভরপুর।

আমার ঠাকুরদাদা নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখলেন তিনি জেগে আছেন কিনা। তখন তাঁর আরকের নেশা ছুটে গিয়েচে। একটু পরে রাত ফর্সা হয়ে জ্যোৎস্না মিলিয়ে গেল। তিনি উদ্‌ভ্রান্ত মস্তিষ্কে হ্রদের পার থেকে হেঁটে চলে এলেন পাহাড়ের কোলে। সেখান থেকে পৌঁছলেন ভীলদের গ্রামে।

বৃদ্ধ ভীল ভৈজি তাঁকে বল্লে—হুজুর, হাঁস নেমেছিল কাল?

ঠাকুরদাদা মিথ্যা কথা বলেন। হাঁস নেমেছিল, কিন্তু একটাও মারতে পারেন নি।

কেন মিথ্যা বল্লেন শুনুন।

কি এক দুর্ব্বার মোহ তাঁকে টানতে লাগলো দুপুরের পর থেকেই—আবার তাঁকে যেতে হবে, নাহারা হ্রদের তীরে রাত্রিকালে। ভৈজিকে সত্য কথা বল্লে পাছে সে বাধা দেয়।

কিন্তু সে রাত্রে বুনো বালি-হাঁসের দল নামলো হ্রদের জলে। আসল হাঁসের দল।

পর পর কয়েক রাত্রি শুধু বন্য-হংসের দল নামে, খেলা করে। আমার ঠাকুরদাদা ঝুপড়ির মধ্যে শুয়ে চেয়ে থাকেন, বন্দুকের গুলি করতে তাঁর মন সরে না।

তারপর আর একদিন শেষরাত্রের জ্যোৎস্নায় বন্যহংসের বদলে নামলো সেই অদ্ভুত জীবের দল।

একদিন তারা আরও কাছে এল, বন্য রাজহংসের মত সাঁতার দিয়ে বেড়াল জলজ ঘাসের বনের পাশে পাশে—তাদের অপূর্ব্ব সুন্দর মুখশ্রী জ্যোৎস্নালোকে ঠাকুরদাদার মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে কতবার পড়লো। রাত ভোর হবার বেশি দেরি নেই, তখনও কিন্তু জ্যোৎস্না আছে; আমার ঠাকুরদাদা কি ভেবে, আরকের নেশায় কিংবা ভালো অবস্থায় জানি নে, ঝুপড়ি থেকে উঠে ছুটে জলের ধারে চল্লেন। বোধ হয় ওদের কাউকে ধরতে গেলেন। অমনি ত্রস্ত বন্যহংসের মত সেই অলৌকিক জীবের দল তাড়াতাড়ি সাঁতরে কে কোথায় দূরে চলে গেল এবং পরক্ষণেই শেষরাত্রের বিলীয়মান চন্দ্রলোকে তাদের লঘু দেহ ভাসিয়ে আকাশপথে অদৃশ্য হ'ল।

পরদিন দুপুরবেলায় আমার ঠাকুরদাদাকে উন্মাদ অবস্থায় হ্রদের ধারের বালির চড়ায় লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখে জনৈক জেলে তাঁকে ভীলদের গ্রামে পৌঁছে দেয়। বৃদ্ধ ভৈজি ঘাড় নেড়ে বল্লে—আমি বলেছিলাম হাঁসের দল যেদিন না নামে, সেদিন বড় ভয়।

ঠাকুরদাদা মাঝে মাঝে ভালো হোতেন, আবার উন্মাদ হয়ে যেতেন। ভালো অবস্থায় বাড়ীতে এ গল্প করেছিলেন, একবার নয়, অনেকবার। মৃত্যুর প্রায় দশ বছর আগে থেকে তাঁর মোটেই ভালো অবস্থা আসেনি। বদ্ধ উন্মাদ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটে।

বিনায়ক দত্ত সিং গল্প শেষ করলেন। আমি বল্লাম—খুব অদ্ভুত ঘটনা, তবে—

মিঃ সিং বল্লেন—তবে বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বাস করা শক্ত। সে আমিও জানি। আমাদের দেশেও সকলে বিশ্বাস করে না। এ আজ পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘটনা বলচি। কেউ বলে, ঠাকুরদাদার অতিরিক্ত আরক সেবনের ফলে ওই সব চোখের ভুল দেখা, বন্যহংসকে ভেবেচেন আকাশ-পরী; আবার কেউ বলে, না—আকাশপরী দেখলেই লোকে পাগল হয়। সেই বৃদ্ধ ভীল ভৈজি সেই কথাই বলতো। কি করে বলব কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যে, তখন আমার জন্ম-ই হয় নি।

থিয়েটারের টিকিট

সকালে উঠেই আভা স্বামীকে বল্লে—ওগো, শীগ্‌গির করে বাজারটা করে এনে দাও—সকাল সকাল রান্নাবাড়া করে আবার তৈরী হ'তে হবে তো? যা বেলা ছোট। অবিনাশ বল্লে—কি কি আনতে হবে, একটা ফর্দ্দ করে রাখো। আমি কলঘর থেকে চট্ করে আসি—আর একটু পরে কলঘর খালি পাওয়া যাবে না।

—এখনই যায় কিনা দেখ—একটা কল, আর এই সাতঘর ভাড়াটে, এখন দোতলার বুধুর মা জল নিতে এসেচে, এই তো দেখে এলুম।

—না, বাড়ীটা বদলাবো এই সামনের মাসেই, এরকম কষ্ট আর পোষায় না। দেখে এস বুধুর মা আছে না গেল—সকালে উঠে একটু চান করবার জো নেই!

আভা খুকীকে কাল রাত্তিরের বাসি রুটি ও একটু গুড় একখানা কলাইকরা রেকাবিতে বার করে দিয়ে চঞ্চল পদে নূত্যের লঘুচটুল ভঙ্গিতে কলঘরের দিকে গেল এবং তখুনি ফিরে এসে বল্লে—শীগগির যাও—এখুনি আবার বুড়ো নিবারণবাবু নাইতে আসবে—খালি আছে—

তারপর সে বাজারের ফর্দ্দ করতে বসলো :—

আলু—একপো

বেগুন—একপো

রাঙা শাক—আধপয়সা

কাঁচকলা—একপয়সা

ধুন—একপয়সা

পান—দু'পয়সা

অবিনাশ কলঘর থেকে ফিরে এসে বল্লে—পান দু'পয়সা?

আভা ঘাড় দুলিয়ে বল্লে—তা হবে না? ওবেলা এককৌটো পান সেজে সঙ্গে করে নিতে হবে না?···রাস্তায় যেখানে সেখানে পান কিনতে আমি তোমায় দেবো না বাপু।

অবিনাশ বাজারে চলে যাওয়ার পরে আভা উনুনে কয়লা দিয়ে কলঘরের দিকে গেল নাইতে।

তবু আজ রবিবার তাই অনেকটা রক্ষে···সময় তাও খুব বেশী কোথায়? খেতে খেতেই তো আজ বেলা বারোটা বেজে যাবে এখন···তারপর সাজগোজ···তৈরী হওয়া···একটার তোপ পড়লে ছুটো বাজতে আর কত দেরি থাকে?

—খুকী, ও খুকী, শোন্ তুই আর আমি এক জায়গায় বসবো কেমন তো? ওমা মুখে সিঁদুর মেখে ভূত হলি যে! তুই ঠিক যেন একটা—হি-হি-হি—

খুকীর হাত থেকে সিঁদুরকৌটো ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে কড়ি থেকে দোদুল্যমান দড়ির শিকেতে তুলে রেখে আভা হাত উঁচু করে ওপরদিকে হাস্যোজ্জ্বল মুখখানা তুলে বল্লে—উড়ে গেল—হুস্—যাঃ—

খুকীর আসন্নপ্রায় কান্না অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে পরিবর্ত্তিত হওয়াতে সে অবাক চোখে মায়ের

হস্তেদিতে প্রদর্শিত ঘরের কড়িকাঠের শূন্যতার দিকে চেয়ে রইল।

আভা বল্লে—আবার আমরা এক জায়গায় যাচ্ছি যে খুকু, কত কি দেখচি, তুই খাবার খাচ্চিস। ছবি, বাজ্‌না কত কি হচ্চে—গাড়ী চড়ব তুই আর আমি—বুঝ্‌লি খুকি, বুঝলি?

অবিনাশ বাজার করে এনে ছোট্ট পায়রার খোপের মত রান্নাঘরটার সামনে নামালো। আভা গামছা খুলে বল্লে—মাছ আননি?

—তেমন মাছ পেলাম না, আবার ওবেলাকার ধরো রিক্‌শাভাড়া রয়েচে—কতকগুলো পয়সা—

—থাক্ গে তবে। তুমি তাহলে কবিরাজের বাড়ী থেকে চট্ করে সেরে এস—বেশী দেরি হয় না যেন। খেতেদেতে ওদিকে আবার—

—যথেষ্ট সময় থাকবে, ভাবনা কি? এই তো য়্যালবার্ট হল্, কতটুকুই বা রাস্তা। যেতে ধরো কুড়ি মিনিট রিক্‌শাতে—গোলদীঘি দেখ নি? সেই সেবার কালীঘাট থেকে আসতে দেখালাম, রেলিং দিয়ে ঘেরা একটা পুকুর, কত লোক বেড়াচ্চে, মনে নেই? ওরই কাছে।

অবিনাশ চলে গেল।

আভা ছুটোছুটি করে রান্না চড়িয়ে দিল।···মনে আজ তার ভারি আনন্দ! কতদিন সে কোথাও বেড়ায় নি, সেই পৌষ মাসে কালীঘাট গিয়েছিল, আর এটা আশ্বিন মাসের প্রথম। ···কোন কিছু দেখা, বা কোথাও যাওয়া তো ঘটেই ওঠে না। লোকে বলে কলকাতা শহরে কত দেখবার জিনিস, কি-ই বা দেখলো সে কলকাতায় এসে? এসেচে তো আজ দু'বছরের ওপর হ'ল।

আর কি করেই বা হবে? খুকীর বাবা একটা কাগজের দোকানে কাজ করে, মাসে ত্রিশটি টাকা মাইনে পায়। ওর মধ্যে দুধ, ওর মধ্যে ঘরভাড়া, ওর মধ্যে কাপড়চোপড়। মাসের শেষে এক একদিন বাজার হয় না, তা বেড়ানো আর থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখা! মুদী ধারে চাল ডাল দেয়, তাই রক্ষে।

ধার চারিদিকে! কয়লাওয়ালা, কেরোসিন তেলওয়ালা, ধোপা, মুদী, বাড়ীভাড়া। তবুও তো ঠিকে ঝিটাকে ওমাস থেকে জবাব দেওয়া হয়েচে, আভা নিজেই সব কাজ করে। খুকী এখন বড় হয়েচে, মাসে দেড়টাকা ঝিয়ের পেছনে দেওয়ার চেয়ে ওই দেড় টাকায় খুকীর আর খুকীর বাপের বিকেলের জলখাবারটা তো হয়ে যায়?

পরশু অবিনাশ এসে একখানা রাঙা কার্ড আভার হাতে দিয়ে বলেছিল, টিকিটখানা ভালো করে রেখে দাও তো আভা।

আভা বল্লে—এ কিসের টিকিট গো?

—ও, আমাদের এসোসিয়েশনের বার্ষিক উৎসব কিনা রবিবার। য়্যালবার্ট হল্ ভাড়া নিয়েচে। তাই একখানা টিকিট দিয়েচে।

—কি হবে সেখানে?

—কনসার্ট হবে, গান হবে। তার পরে খাওয়াদাওয়া আছে।

—আমার জন্যে একখানা টিকিট আনলে না কেন? আর দেয় না? বেশ গান শুনতুম, দেখতুম কি হয়। কতকাল তো কোথাও বেরুইনি। দেখা না যদি পাওয়া যায়—

তাই অবিনাশ কাল শনিবারে আর একখানা রাঙা টিকিট এনেচে।

খাওয়াদাওয়া সারাসোরা হয়ে গেলে আভা আর একটুও বসেনি। এক বালতি জল ওবেলা অতিকষ্টে মারামারি করে কলঘর থেকে সংগ্রহ করেছিল—নইলে বেলা দুটোর সময় গা ধোয়ার জল কোথায় পাওয়া যাবে? সাত ঘর ভাড়াটের সঙ্গে একত্রে বাস, ন্যায্য নাইবার জল তাই মেলে না—তা আবার অসময়ে শখের গা ধোওয়া! কি কষ্ট যে জলের এ বাসাতে!

আভা আগে আগে অবাক্ হয়ে যেতো জলের কষ্ট দেখে। নদীর ধারের পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, মাপজোপ করে জল ব্যবহার করবার কল্পনা সে করতে পারতো না। এখন অবিশ্যি সব সয়ে গেছে।

সাবান মেখে, গা ধুয়ে, সাজগোজ করতে বেলা আড়াইটে বেজে গেল। রিক্‌শা ডাকতে আর একটু দেরি হ'ল। ওরা যখন বাসা থেকে বেরুলো, তখন পৌনে তিনটে।

আভা অধীর আগ্রহে চেয়ে আছে কতক্ষণে সেই রেলিং-দেওয়া পুকুরটা দেখা যাবে—যার ধারে—ঐ যে কি নাম জায়গাটার?

য়্যালবার্ট হল্? খুব বড় বাড়ী? ক'তালা? তোমাদের ক'তালায় সভা হবে?

কিন্তু সকলের চেয়ে আকর্ষণের বিষয়—কাগজের দোকানের লোকেরা মিলে এখানে আজ থিয়েটার করবে। থিয়েটার কি জিনিস, আভা কখনও দেখে নি।

ওদের রিক্‌শা যখন সংস্কৃত কলেজের কাছাকাছি এসে পৌঁছেচে, তখন দূরাগত সমুদ্র-কল্লোলের মত একটা শব্দ ওদের কর্ণগোচর হ'ল। অবিনাশ ঘাড় উঁচু করে যা চেয়ে দেখলে, তাতে তার তো চক্ষু স্থির।

প্রথমটা ওর মনে হোল য়্যালবার্ট হলে ঢোকবার দরজার সামনে রাস্তার ওপর একটা বুঝি দাঙ্গা চলচে।

প্রায় শ' দুই আড়াই লোক এক জায়গায় জড় হয়ে একযোগে চীৎকার, ঠেলাঠেলি করচে—য়্যালবার্ট হলের কলেজ স্ট্রীটের দিকের সিঁড়ির মুখ থেকে জনতা শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটের মোড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

অবিনাশ বল্লে—এঃ, বড্ড ভিড় জমে গেছে দেখচি!

ভিড় ঠেলে রিক্‌শা থেকে নেমে ওরা কোন রকমে দরজা পর্য্যন্ত গেল বটে, কিন্তু আর এগোনো অসম্ভব। সিঁড়িটা লোকে লোকারণ্য। একটা দলের সঙ্গে ওরা ওপরে খানিকদূর উঠতে গেল ব্যস্তসমস্ত হয়ে—আভা ভাবলে না জানি কি অদ্ভুত ব্যাপার চলচে ওপরে, যা দেখবার জন্যে এত ভিড়—কিন্তু দু-চার সিঁড়ির ধাপ উঠতে না উঠতে ওপর থেকে আর এক দলের ধাক্কা খেয়ে আভা ছিট্‌কে এসে পড়ল দেওয়ালের গায়ে। ওদের চারিপাশে ভিড় জমে গেল! আভার কপালে বেশ লেগেচে দেওয়ালে ঠুকে গিয়ে, ফুলে উঠেচে এরই মধ্যে। সবাই বলে—আহা, কোথায় লাগলো! জনতার কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে আভা জড়সড় হয়ে গেল। একজন ঘর্মাক্তকলেবর ভলান্টিয়ার এসে অবিনাশকে

বল্লে—আহা-হা, কোথায় লেগেচে!···আপনি এই ভিড়ে মেয়েদের এনেচেন? ভাল করেন নি। আচ্ছা, আপনি ওঁকে নিয়ে বাইরে দাঁড়ান। দেখি আমি।

সত্যই দেখা গেল জনতার মধ্যে আর কোন মেয়ে নেই—মেয়ের মধ্যে একা আভা আর তার আড়াই বছরের খুকি···

অবিনাশ আভাকে ভিড়ের মধ্য থেকে বার করে এনে খানিকক্ষণ ফুটপাথে দাঁড় করিয়ে রাখলে। ঝাড়া কুড়ি মিনিট কেটে গেল, কারো দেখা নেই। ওপর তালার খোলা জানালা দিয়ে নিচে বাজ্‌নার শব্দ যেন কানে আসচে। আভা অধীর ভাবে বল্লে—কই কেউ তো এল না? ওপরে যাবে না?···এইবার চলো দিকি সিঁড়ির ধারে?

অবিনাশ আর একবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলে ভলাণ্টিয়ারেরা কাউকে ওপরে যেতে দিচ্চে না। একজন বল্লে—মশাই, ওপরে মেয়েদের নিয়ে যেতে আপনাকে পরামর্শ দিই নে। মারামারি হচ্চে সেখানে। আর একটি মেয়েও নেই—কোথায় মেয়েদের নিয়ে যাবেন সেখানে?

আভা লজ্জায় মরে গেল।

ফিরবার পথে, রিক্‌শায় উঠে তখন উত্তেজনা ও আগ্রহ কমে গিয়ে আভার ওপর অবিনাশের করুণা হ'ল। অতগুলো পুরুষের ভিড়ের মধ্যে সেজেগুজে সে থিয়েটার দেখতে এসেচে আশা করে, জানেও না আজকের আসাটা কতটা অশোভন দেখালো। কি ভাবলে সবাই···। ও দুঃখিত হয়েচে থিয়েটার দেখতে না পেয়ে! স্ত্রীকে বল্লে—খুব লেগেচে নাকি কপালে? দেখি? দেখাও হ'ল না, কিছুই না—যাতায়াতে রিক্‌শা ভাড়া দু'আনা পয়সাই দণ্ড মিছিমিছি!

আভা কিন্তু ভাবছিল তার আঁচলে-বাঁধা রাঙা টিকিট দুখানার কথা। কাল খুকীর বাবা তাকেই রাখতে দিয়েছিল, আজ সে হুঁশিয়ার হয়ে আঁচলে বেঁধে এনেছিল টিকিট দুখানা! কত কষ্টে যোগাড় করা, কোনো কাজেই এল না, মিছামিছি গেল!

পার্থক্য

সকাল হইতে ভিখিরীর উপদ্রব লাগিয়াই আছে।

এদিকে ঘরে চাউল নাই, ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে। গৃহিণী জানাইলেন, চাউল যা আছে তাহাতে আর দিন চারেক চলিবে। বাজারে চাউল নাই এ কথা বলিলে ভুল হইবে, আছে চোরাবাজারে, সাঁইত্রিশ টাকা মণ।

গৃহিণীকে শুনাইয়া বলি—ভাতের ক্যানে যা কিছু সার অংশ থাকে। ফ্যান যে ফেলে দেওয়া হয় ওতে সত্যিই আমাদের বড্ড···মানে যা কিছু পুষ্টিকর ওর সঙ্গে বেরিয়ে যায়। সাহেবেরা ফ্যান ফেলে না, জাপানীরা ফেলে না।

আমার ইঙ্গিত বাড়ীর কেহই বুঝিল না। ঝরঝরে ভাতই খাইতে লাগিলাম।

শুনিলাম আর দু'দিন চলিবে চাউলে। তার উপর ভিখিরী। সকাল হইতেই শোন

—মা দু'টি চাল দেন, মা একটু ফ্যান—

মনে সহানুভূতি জাগায় না, রাগ ধরে। ঘরে নাই চাউল, কেবল ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও, সকাল হইতে! হিসাব-করা চাউল আজকাল। এদিকে বাজারে ও-দ্রব্য প্রায় অমিল। সাইত্রিশ টাকা দরে চাউল কিনিয়া কতদিন চালাইব! কায়ক্লেশে যদি বা চলে, ভিখিরীর উপদ্রবে আর তো পারি না! অথচ ভিক্ষা মিলিবে না বলিতে পারি না, সংস্কারে বাধে।

বাল্যে পল্লীগ্রামের বাড়ীতে থাকিতে দেখিতাম, মুষ্টিভিক্ষা হইতে ফকির বৈষ্ণবকে কেহ কখনো বঞ্চিত করিত না। সেই হইতে কেমন একটা সংস্কার দাঁড়াইয়া গিয়াছে—ভিক্ষা না দিয়া পারি না।

কিন্তু আসিলে বিরক্ত হই। না আসিলেই যেন ভালো।

সকালে ছোট ঘরে বসিয়া লিখিতেছি, চাকর বাজার হইতে বাড়ী ঢুকিল হাতে মাঝারি গোছের একটি পুঁটুলি। বাড়ীর ভিতর হইতে মেয়েরা কি চাউল আনিতে পাঠাইয়াছিল? ভাঁড়ার খালি? বলিলাম—ওতে কি রে?

রাজেন চাকরটি জিনিসটা লুকাইয়া লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, ভাবে বুঝিলাম। ধরা পড়িয়া একটু অপ্রতিভ হইল। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—চাল আজ্ঞে।

—ও, কত?

—দু'সের করে চাল আজ্ঞে জহুরীর দোকানে। কনট্রোল—

—ও, কনট্রোলের দোকান তাহোলে এখানেও হ'ল? কত দিচ্চে?

—দু টাকার বেশি দেবে না আজ্ঞে।

এটা বাঙলা নয়, বিহার। তবুও এখানে কনট্রোল খুলিল, দু টাকার বেশি চাউল কাহাকেও দেওয়া হইবে না—এ সব কি?

একজন ভিখিরী আসিয়া হাঁকিল—ভিক্ষে দেন না—চাড্ডি ভিক্ষে—

রাজেন বলিল—ভিক্ষে হবে না যাও, চাল নেই—

লিখিতে লিখিতে বলিলাম—দে এক মুঠো দে—

সঙ্গে সঙ্গে আসিল আর একজন। তাহাকেও ভিক্ষা দেওয়া হইল।

বেলা ন'টা আন্দাজ সময়ে আরও দুইজন। ভিক্ষা লইয়া তাহারাও চলিয়া গেল। এইবার একজন বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। মনে তখন বিরক্তি ধরিয়াছে, রাজেনকে বলিলাম, ভিক্ষা না দেয়। কিন্তু তবুও লোকটা কেন দেরি করিতে লাগিল, কেন তবুও যায় না, বার বার একঘেয়ে চীৎকার করিতে লাগিল। বড়ই রাগ হইল। বাহির হইয়া বলিলাম—ভিক্ষে হবে না, চলে যাও—আবার কি?

লোকটি বৃদ্ধ। পরনে একটুকরা মলিন নেকড়া, হাতে একটা তোবড়ানো টিনের মগ। জীর্ণ শীর্ণ চেহারা বটে, তবে বাংলাদেশের ভিখিরীর মত কঙ্কালসার নয়।

লোকটা মগটা তুলিয়া টানিয়া টানিয়া বলিল—একটু ফ্যান দাও বাবা—বড্ড খিদে পেয়েচে—

রাগিয়া বলিলাম—কি আকার রে! আবার ভাতের ফ্যান—

—দেন বাবা একটুখানি—

—ভাগ এখান থেকে! যাঃ—আব্দার ছাখো—কোন্ সকালে রান্না হয়েচে, এখন ফ্যান রয়েচে ওর জন্যে!

লোকটা হতাশভাবে চলিয়া গেল, আবার লিখিতে বসিলাম। ইহাতে আমার সংস্কারে বাধিল না। প্রতিদিন বরাদ্দ মত মুষ্টি-ভিক্ষা তো দিয়াছি। ক'জনকে দেওয়া যায়? বেলা বাড়িল, স্নান করিতে যাইব। এমন সময় একটি প্রৌঢ় ব্যক্তি গায়ে অর্দ্ধমলিন পিরান, পায়ে চটি জুতা, হাতে এক গাছা বাঁশের লাঠি, জানালার কাছে দাঁড়াইয়া বলিল—বাবু, আপনারা ব্রাহ্মণ?

মুখ তুলিয়া তারের বেড়ার ওপারে চাহিয়া বলিলাম—কেন, কি চাই?

লোকটা হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—ব্রাহ্মণেভ্যো নমো—

প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলাম—কোত্থেকে আসা হচ্চে?

—বাবু, ঢুকবো বাড়ীর ভেতর? আমিও ব্রাহ্মণ।

—হ্যাঁ আসুন।

লোকটা বাড়ীতে ঢুকিল বটে, কিন্তু বারান্দায় না উঠিয়া উঠানেই দাড়াইয়া বলিল—একটা কথা আছে। অনেক খুঁজেচি, ব্রাহ্মণবাড়ী পাই নি। আমার বাড়ী নদে-শান্তিপুর—মুসাবনীতে আমার এক আত্মীয় কাজ করে, সেখানেই যাচ্চি। সঙ্গে একটি ছোট ছেলে আছে, ওই আতা-তলায় বসিয়ে রেখে এসেচি। একটু খাবার জল যদি আমাদের দেন—

—হ্যাঁ হ্যাঁ—তার আর বেশি কথা কি—বিলক্ষণ। ডেকে আনুন, ডেকে আনুন।

ছেলেটিও আসিল। দেখিয়া বুঝিলাম, ইহারাও দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভিক্ষুক। মুখে খাদ্য চাহিতে পারিতেছে না। বলিলাম—আপনাদের খাওয়া হয়নি তো, এত বেলায় কোথায় যাবেন—এখানেই দুটো ডাল ভাত—

—না না, একটু জল খেয়েই যাবো। আপনাকে আর কোন বিরক্ত···মুসাবনীতে আমার ভাইপো—

—সে কি হয়! বসুন বসুন—মুসাবনী এখান থেকে ছ'মাইল পথ।

না খাওয়াইয়া ছাড়িলাম না। দু'জনে খাইয়া দাইয়া বিশ্রাম করিয়া বিকালের দিকে চলিয়া গেল।

রাত্রে শুইবার সময় হঠাৎ মনে পড়িল—এ কেমন হইল? ভাতের ফ্যান চাহিতে ভিখিরীর উপর রাগিয়া উঠিলাম, অথচ নদে-শান্তিপুরের ব্রাহ্মণ শুনিয়া আদর করিয়া দু'জনকে খাওয়াইলাম, তখন তো চাউল বাঁচাইবার কথা মনে উঠিল না?

কেন এমন হয়?

ভাবিয়া দেখিলাম—ইহার কারণ সে ভিখিরী আমার শ্রেণীর মানুষ নয়। নিজেকে আমি ভিখিরীরূপে কল্পনা করিতে পারি না, কিন্তু মনে মনে নিজেকে নদীয়াবাসী দরিদ্র-ব্রাহ্মণরূপে অনায়াসে কল্পনা করিতে পারি।

স্বপ্ন-বাসুদেব

খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের কথা। আজ থেকে প্রায় বাইশ শ' বছর আগের তক্ষশিলা।

নগরীর রাজপথ কোলাহলমুখর। নবারুণোদয় নিজ মহিমায় ধীরে ধীরে উচ্চ চূড়ায় ও স্তম্ভে নবপ্রভাতের বাণী ঘোষণা করচে। তক্ষশিলায় সম্প্রতি দেবী মিনার্ভার এক মন্দির তৈরী হচ্ছে, পার্থেননের স্থাপত্যের অনুকরণে—গম্বুজ বা ডোম কোথাও নেই—ছাদ সমতল, অগণিত সুসমঞ্জস বিরাট স্তম্ভশ্রেণী। গ্রীক স্থাপত্য গম্বুজের খিলান গড়তে অভ্যস্ত ছিল না। বহু পরবর্ত্তী কালে সারাসেন সভ্যতার যুগে ইউরোপে এর উৎপত্তি, সারাসেন তথা মূর সভ্যতার দান এটি।

বড় বড় স্প্রিংবিহীন কাঠ ও লোহার তৈরী একার ধরণের গাড়ীতে মাঝে মাঝে দু'চারজন ধনী বণিক ও গ্রীক জমিদারগণ যাতায়াত করচেন। সুন্দরী গ্রীক বালিকাও মাঝে মাঝে রথে চড়ে চলেচে—দেবী এথেনির মত। ব্রোঞ্জের বিরাট জুপিটারমূর্ত্তি প্রস্তরের ছত্রাবরণতলে শোভা পাচ্চে রাজপথের মোড়ে। বণিকগণের আপণশ্রেণীতে কত কি জিনিস—কত দেশ থেকে আহরণ করে আনা।

একটি সুবেশ বালক ভৃত্য একটি দোকানে এসে বল্লে—কলা আছে?

—আছে, দাম বেশি পড়বে।

—কোথাকার কলা?

—এই কাছের গাঁয়ের। বুড়ো রোজ টাটকা দিয়ে যায়।

—আর আঙুর?

—মদ তৈরী করবার জন্যে সামান্য কিছু এনেছিলাম,—নিয়ে যাও।

হঠাৎ রাজপথকে চমকিত করে তূর্য্য বেজে উঠলো। মহারাজ এ্যান্টিআলকিডাসের মহামাত্য ডিওন ভ্রমণে বেরিয়েচেন—রাজপথ কাঁপিয়ে শ্বেতাশ্ববাহিত টাঙায়, রাজপুরুষ ডিওন চলে গেলেন—বালক ভৃত্যটি হাঁ করে চেয়ে রইল।

দোকানদার বল্লে—তোমার কর্ত্তা কোথায় চল্লেন?

বালক তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বল্লে—কি জানি বাপু! সে খোঁজে আমার দরকার কি?

—ওঁর ছেলে কি এখনো সেই বিদেশে?

—তিনি কাল এসেচেন মালব থেকে। সেখান থেকে এসেই অসুখ বাধিয়েছেন বলেই ফল নিতে এসেচি এত সকালে। বলবো কি—পদ্মসাকড়ির অবস্থা ভালো না। রাজা মাইনে দেন না ঠিকমত—লুটে-পুটে নিয়ে যা চলে।

দোকানদার অধীরভাবে বলে উঠলো—যাও, যাও—আমরা গরীব লোক, আমার দোকানে ওসব—এক্ষুনি কে শুনবে। তোমার কি, বড়লোকের চাকর—সুন্দর মুখের সব মাপ—

এই কথার মধ্যে কিঞ্চিৎ বক্রোক্তি ছিল। ভৃত্য সে উক্তি গায়ে না মেখেই চলে গেল।

একটু পরে স্বয়ং ডিওনপুত্র হেলিওডোরাস এসে ফলের দোকানের সামনে দাঁড়াল। সুগঠিত-দেহ সৌম্যকান্তি গ্রীক যুবক, রঙ অনেকটা আধুনিককালের পেশোয়ারী মুসলমানের মত। দীর্ঘ দেহ, ঈষৎ কুঞ্চিত কেশ, চক্ষু দুটি নীল নয়—কটা। হেলিওডোরাস চাকা ছুঁড়বার প্রতিযোগিতায় দু'বার সকলকে পরাজিত করে মহারাজ এ্যান্টিআলকিডাসের প্রকাশ্য সভায় পুরস্কার পেয়েছেন। তক্ষশিলার অনেক লোকে তাঁকে চেনে। কপিলা থেকে আনীত বিদেশী সুরা খুব চড়া মূল্যে বিক্রী হয় তক্ষশিলার বাজারে। সাধারণ লোকের সাধ্য নেই তা কেনে—কিন্তু হেলিওডোরাস বন্ধুবান্ধব নিয়ে সরাইখানায় বসে ফূর্তি করবার সময়ে কপিলার সুরা ব্যতীত অন্য কিছু চায় না।

ফলের দোকানের মালিক সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে বল্লে—আসুন ছোটকর্ত্তা, আমার আজ বড় সৌভাগ্য—এত সকালে আপনার পায়ের ধুলো পড়লো এ গরীবের দোকানে।

হেলিওডোরাস ঈষৎ গর্ব্বিত সুরে বল্লে—জুজু এখানে এসেছিল?

—হাঁ কর্ত্তা, এইমাত্র চলে গেল।

—আঙুর দিয়েচ তাকে?

কথার উত্তর দোকানীর কাছ থেকে শুনবার আগেই হেলিওডোরাস চলে গেল। দোকানী অনেকক্ষণ একদৃষ্টে হেলিওডোরাসের অপসৃয়মাণ সুন্দর চেহারার দিকে চেয়ে রইল।

ডিওনের আর্থিক অবস্থা আজকাল সত্যই ভালো নয়। রাজার দরবারে তিনি সভাসদ বটে, কিন্তু রাজা এ্যান্টিআলকিডাসের নিজেরই আর্থিক অবস্থা যা, তাতে সভাসদদের অর্থ-সাহায্য করবার অবস্থা নয় তাঁর। গান্ধারের রাজা জোজিকাস ও পুরুষপুরের গ্রীক তালুকদার হিরাক্লিয়াসের সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ লেগেই আছে—রাজকোষের যাবতীয় অর্থ এখন ওদিকেই ওড়ে। আপনি বাঁচলে বাপের নাম, সুতরাং ডিওন এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ ঠিকমত বেতন পান না, বাজারের বণিক ও প্রজাদের নিকট নানা ছলে অর্থশোষণ করেন। এঁদের মধ্যে ডিওন প্রধান সভাসদ, সুতরাং তাঁর অত্যাচারে তক্ষশিলার বিত্তশালী প্রজা ও বণিক মাত্রেই তাঁর ওপর যথেষ্ট বিরক্ত।

রাজা এ্যান্টিআলকিডাস ব্যাক্ট্রিয়ান গ্রীক—সুতরাং ভারতীয় প্রজা যত বেশি উৎপীড়িত হয়—গ্রীক ব্যবসায়ী বা প্রজা তার অর্দ্ধেকও না। দু'বার ভারতীয় বণিকসঙ্ঘ প্রতিবাদ করেছিল সভাসদের এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে। সভাসদ তাই কি, বিনা পয়সায় জিনিস দেওয়া হবে না—তিনি যিনিই হোন। ধার নিয়ে উপুড়-হাত করবেন না সব। কিসের খাতির? এ ব্যবস্থা টেকে নি। গান্ধার থেকে সার্থবাহ বণিক সম্প্রদায় উষ্ট্রপৃষ্ঠে উৎকৃষ্ট সুরা ও বিদেশী ফল নিয়ে আসতো—এরা তার উপর অতিরিক্ত শুল্ক বসালে, বাজারে অত চড়া দামে সে সব খাবার লোক রইল না। দু'বার বাজারে দোকান লুঠ হোল—এই সব নানা উপদ্রব। গ্রীক বণিকগণও যে এ অত্যাচার থেকে একেবারে মুক্ত তা নয়, তবুও তাদের প্রতি অত্যাচার

এদের তুলনায় অত্যন্ত কম।

হেলিওডোরাসকে ঠিক এই জন্যে কোনো ভারতীয় প্রজা পছন্দ করতো না। সে ছিল উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্ধত—'গ্রীক ছাড়া অন্য কেউ মানুষ নয়' এই তার মত। তার আদর্শ পুরুষ হ'ল লিওনিডাস, যিনি থার্মপলির গিরিসঙ্কটে অমর হয়ে আছেন, থেমেস্টোক্লিস যিনি টেম্পি গিরিবর্ত্ম রক্ষা করেছিলেন দশ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক হয়ে—দিগ্বিজয়ী অ্যালেকজাণ্ডার,—যাঁর বাহুবলে আজ ভারতে গ্রীক রাজ্য সম্ভব হয়েচে।

ব্যাকট্রিয়ান গ্রীকদের জীবনযাত্রা ও আচারব্যবহার অনেক সময় তার চোখে ভালো লাগতো না। একজন খাঁটি গ্রীক স্কুলমাস্টার তক্ষশিলার রাজসভায় দিনকতক এসেছিলেন, ছেলে পড়াতেন বড়লোকের বাড়ীর, তাঁর নাম পলিফাইলস্—রীতিমত পণ্ডিত। তাঁকে নিয়ে সে সময় কাড়াকাড়ি পড়ে গেল বড়লোকদের মধ্যে, কে তাঁকে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করতে পারে, কারণ এথেন্স থেকে তিনি এসেছিলেন। হেলিওডোরাস তখন বালক, তাকে তিনি বলতেন—তোমাকে দেখে আমার প্রাচীন যুগের গ্রীক যুবকদের কথা মনে পড়ে। শরীরটা স্পার্টার ছেলেদের মত শক্ত করো। এদেশে কিছু নেই। নামেই গ্রীক্।

—কেন?

—গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। এদেশের গ্রীকরা অতিরিক্ত বিলাসী ও আরামপ্রিয় হয়ে পড়েচে। পূর্ব্বপুরুষের রক্তের সে তেজ নেই এদের মধ্যে। শুধু তা নয়, এরা দেশী লোকের সঙ্গে যেভাবে মেশে, অনেকে দেশী খাদ্য খায় ও পরিচ্ছদ ধারণ করে, যেমন সেদিন এক গ্রীক ভদ্রলোকের গায়ে কাশ্মীরী শাল দেখলাম—ছিঃ ছিঃ, লজ্জাও করে না!···বেশি কথা কি বলবো, অনেকে এদেশী মেয়েদের সঙ্গে—

এইসময় স্কুলমাস্টারের হঠাৎ মনে পড়তো যে তাঁর শ্রোতা বালক এবং ছাত্র। স্বজাতির অধঃপতনের দুঃখে যা বলে ফেলেচেন তা যথেষ্ট। বলে উঠলেন—তা ছাড়া, দেখচো না গ্রীক রাজধানী তক্ষশিলা বৌদ্ধ বিহারে ভরা। যাকগে। কবিতা মুখস্থ বলে যাও—

কখনো কখনো ভীষণ গ্রীষ্মের দিনে তক্ষশিলার কোনো প্রমোদ-উদ্যানের মধ্যে নিভৃত কুঞ্জে ছায়াসনে তিনি ছাত্রদের নিয়ে বসতেন। অতীত যুগের গ্রীকদের বীরত্ব, আত্মত্যাগ প্রভৃতি জলন্ত ভাষায় বর্ণনা করে যেতেন, ইউরিপিডিস্ ও সাফোর কবিতা আবৃত্তি করতেন, প্লেটোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদেশাবলী বুঝিয়ে দিতেন। কয়েক বছর তক্ষশিলায় থাকার পরে তিনি হঠাৎ কোথায় চলে যান। জনশ্রুতি যে, তিনি এই সময় স্বদেশে ফিরতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে আর একবার তিনি প্রিয় জন্মভূমির পবিত্র মৃত্তিকা স্পর্শ করতে চান।

সেই থেকে হেলিওডোরাস পূর্ব্বপুরুষের গৌরবে গৌরবান্বিত, ভারতীয়দের সে ঘৃণাই করে—স্পার্টার যুবকদের আদর্শে শরীর গড়ে তুলেচে—ভারতীয়দের সঙ্গে গ্রীকরা যে বেশি মেলামেশা করে, এটা সে পছন্দ করে না—এমন কি তার পিতা ডিওনকে পর্য্যন্ত এজন্য সে

ঠিক শ্রদ্ধা করতে পারে না। কারণ দু'তিনটি ভারতীয় নর্ত্তকীর বাড়ীতে এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর যাতায়াত। যাক্ সে সব কথা। এদিকে হেলিওডোরাসের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অত্যাচারে তক্ষশিলার অনেকেই অতিষ্ঠ। সে লম্পট নয়, কিন্তু সুরাপায়ী, উদ্ধত—লোকের মান রাখে না, দোকানের জিনিস ধারে নিয়ে গিয়ে দাম দেয় না—দু'তিনটি নরহত্যা পর্য্যন্ত করেচে সুরার ঝোঁকে।

কেন তা বলি।

মেলিবিয়া নামে একটি রূপসী গ্রীক গায়িকা আজ বছর দুই হ'ল ব্যাক্‌ট্রিয়া ও গান্ধার হয়ে এখানে আসে উপার্জ্জনের চেষ্টায়। গান্ধাররাজ জোজিফাসের সভায় খুব নাম কিনে এসেছিল। এখানে সে পদার্পণ করার দিনটি থেকে তক্ষশিলার অনেক যুবক ও প্রৌঢ়ের নজরে পড়ে গেল। প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার হিড়িক শুরু হ'ল। বহু গ্রীক যুবক, প্রৌঢ়, এমন কি বৃদ্ধের প্রণয় উপেক্ষা করে (এদের দলে হেলিওডোরাসও ছিল) সুন্দরী মেলিবিয়া প্রসন্নদৃষ্টিতে চাইল সুমঙ্গল বলে এক ভারতীয় বণিকের প্রতি, এমনি অদৃষ্টের ফের। প্রকাশ্য দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে হেলিওডোরাস সুমঙ্গলকে। মেলিবিয়া এতে বাধা দেয়—তার পর একদিন এক সরাইখানায় সামান্য ছলে ঝগড়া বাধিয়ে হেলিওডোরাস সুমঙ্গলকে হত্যা করে। খুব গোলমাল বাধে এ নিয়ে।

রাজদরবারে অভিযোগ উপস্থিত হ'ল হেলিওডোরাসের বিরুদ্ধে। ভারতীয় বণিকসঙ্ঘ রাজাকে ধরলে এর সুবিচার করতেই হবে। তাদের কাছে টাকা ধার না করলে রাজার চলে না। ফলে মহারাজ এ্যান্টিআলকিডাস্ তাঁর সভাসদ ডিওনকে ডেকে বলে দিলেন কিছুদিনের জন্য হেলিওডোরাসকে সরিয়ে দেওয়া দরকার তক্ষশিলা থেকে। মালবের রাজা ভাগভদ্রের সভায় যে গ্রীক দূত ছিল, তার মৃত্যু হয়েছিল সম্প্রতি—সেখানেই আপাতত ওকে পাঠানো হোক। বলা হবে রাজার বিচারে ওর নির্ব্বাসন-দণ্ড দেওয়া হ'ল।

সুতরাং গত শীত ঋতুর প্রারম্ভে হেলিওডোরাস মালবের রাজা ভাগভদ্রের রাজসভায় প্রেরিত হয়।

তক্ষশিলায় পুনরায় আসার উদ্দেশ্য ছিল—মেলিবিয়ার সন্ধানে ? কিন্তু হায়! সেই কেলেঙ্কারির পরে বেচারি গ্রীক গায়িকাকে এ রাজ্য ছাড়তে হয়েচে। মেলিবিয়া এখন পুরুষপুরের তালুকদার হিরাক্লিয়াসের অতিথি, অন্তত সেই রকম জনপ্রবাদ।

ডিওন বল্‌লে—হেলিওডোর, এখানে আবার এসে ঘুরঘুর করচো কেন ? বুড়ো বয়সে কি চাকরিটা খোয়াবো তোমার জন্যে ?

—আজ্ঞে না, আমি এসেছিলাম শরীর সারাতে। ওখানে যে দিশি বদ্দি আছে তাদের হাঁড়ের শেকড়-বাকড় ওষুধ খেলে হাতী মারা পড়ে, মানুষ কোন্ ছার! আর দেশটাতেও বড় বিষম জ্বরের—

—বাবা, তুমি আমার নয়নের আনন্দ। কিন্তু জুপিটারের শপথ করে বলচি, আমার হাতে একটি পয়সা নেই যা তোমার জন্যে রেখে যেতে পারিবো। এ হতভাগা রাজ্যে কিছু

উন্নতি নেই, এদের ঘুণে ধরেচে। ঋণের বোঝা রাজকোষকে ছাপিয়ে উঠেচে। নতুন দেশে যদি কিছু উপার্জ্জন করতে পারো—আখেরে ভালো হবে।

শরতের অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। ডিওন তার প্রণয়িনীর বাড়ীতে আরও কয়েকটি বন্ধুবান্ধব নিয়ে আমোদ-প্রমোদ করতে গেলেন। তক্ষশিলার মধ্যেই এক সংকীর্ণ রাস্তার ধারে বাড়ীটি। কার্নিসে পাথরের ছোট ছোট থামের মাঝে মাঝে ফোকর-কাটা ইটের নিচু পাঁচিল।

একজন বললে—শুনেচ হে, কাঞ্চীনগরের তালুকদারের ছেলে এ্যারিস্টোস্ সম্প্রতি বৌদ্ধ হয়েচে!

অন্য বন্ধু বললে—তুমি যা শুনেচ ন্যানিফাস, সত্যি হওয়া আশ্চর্য্য নয়। রাজা মিনাণ্ডার গ্রীক কুলাঙ্গার, নইলে গ্রীক রক্ত যার গায়ে আছে, সে দেশী ধর্ম গ্রহণ করে কি হিসেবে? ওর শ্বশুরকে আমি জানি, ব্যাকট্রিয়ায় তার অনেক তালুক-মুলুক, ভালো বংশের ছেলে—এ্যান্টিগোনাস গোনাটাসের মাসতুতো ভাইয়ের শালার বংশ।

—কে?

—ওই রাজা মিনাণ্ডারের শ্বশুর। জামাইয়ের এই কুমতি শুনবার পরে বেচারী একেবারে শয্যাগ্রহণ করেচেন।

নিয়ারা কোথায় গেল?…

ডিওন আজ বেশি সুরা পান করেননি। মন তাঁর ভালো নয়, ছেলেটা আজ কি কাল বাড়ী থেকে চলে যাবে, সঙ্গে এবার তিনি তাঁর প্রিয় বালক-ভৃত্য জোজিফাস ওরফে জুজুকে প্রবাসে ছেলের সেবা করতে পাঠাবেন। ডিওন অনেকদিন বিপত্নীক, বাড়ীতে প্রিয়দর্শন পুত্র ও বালক-ভৃত্যটিও অনুপস্থিত থাকবে। একপাল দাসীদের মধ্যে (তাদের মধ্যে অনেকেই অসন্তুষ্ট, কারণ সময়মত বেতন পায় না) সন্ধ্যা কাটানো এই বয়সে ভাল লাগে?……কি যে করবেন—

নিয়ারা প্রবেশ করলে, বয়সে সে ডিওনের চেয়ে অনেক ছোট, তবুও চল্লিশের কম নয়, কিন্তু দেখায় ত্রিশ। সোনালীপাড় দামী রেশমী অঙ্গাবরণ, দুটি বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে ওর গৌর অঙ্গের শোভা বর্দ্ধিত করচে। কিন্তু মাথায় গ্রীক মহিলাদের ন্যায় পুষ্পমাল্য, সুন্দর চোখের ভুরু কাশ্মীরী জাফ্রানের রেণু, চন্দন ও বার্চ্চ বৃক্ষের আটা মিশিয়ে চিত্রিত করা। তাতে চোখের ভুরু দুটি কালো না দেখিয়ে হলদে দেখাচ্ছে। নিয়ারার পিতা ব্যাকট্রিয়ান গ্রীক, কিন্তু মাতা পারস্যদেশীয়া।

ন্যানিফালের কথার উত্তরে নিয়ারা বল্লে—আমার গুরু এসেচেন, তাই আনন্দে কথাবার্ত্তা বলছিলুম তাঁর সঙ্গে।

ন্যানিফাল বল্লে—সে আবার কে?

—তিনি একজন ভারতীয় যোগী। বারাণসী থেকে এসেচেন—

সবাই একবাক্যে বলে উঠলো—আমরা একবার দেখবো—

—তিনি কাউকে দেখা দেন না। কারো কাছে কিছু চান না তো তিনি।

ন্যানিফাস বল্লে—আচ্ছা নিয়ারা, তুমি একজন এদেশী ধাপ্পাবাজের পাল্লায় পড়ে গেলে কি বলে? এ যে-রকম শুরু হোল দেখচি, কবে আমাদের বন্ধু ডিওন মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধ ভিক্ষু না হয়ে দাঁড়ায়!

সুরাপায়ী, বিলাসী, স্থূলদেহ ডিওন পক্ককেশে পুষ্পমাল্য ধারণ করে একপাশে পর্য্যঙ্কে শুয়ে ছিলেন, তাঁকে মুণ্ডিত-মস্তকে বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশে কল্পনা করে সর্ব্বপ্রথমে প্রৌঢ়া সুন্দরী নিয়ারা হি-হি করে হেসে গড়িয়ে পড়লো, পরে ডিওনের সব বন্ধুই সেই হাসিতে যোগদান করলে।

এমন সময় দেখা গেল, একজন দীর্ঘদেহ কৌপীনধারী লোক, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি মাখা, হাতে কমণ্ডলু, আয়ত চক্ষুর্দ্বয় জ্যোতিষ্মান্—কোন্ সময়ে ছাদের ওপর এসে দাঁড়িয়েচে। সকলে চমকে উঠলো—ডিওন বল্লে—কে তুমি?

সন্ন্যাসী বল্লেন—বাবাজিদের জয় হোক।

—কি?……এ উত্তর শুধু ডিওন দিলেন।

—এই মেয়েটি আমায় বড় মানে। আমি একে এই পাপজীবন থেকে উদ্ধার করতে চাই। আপনারা এখানে আর আসবেন না।

—কোথায় যাবো আমরা? তুমি কোন্ নবাব এলে জানতে পারি কি?

সন্ন্যাসী রোষকষায়িত নেত্রে বল্লেন—বৃদ্ধ লম্পট। পরকালের দিন সমাগত, ভয় হয় না? এখনও এই সব—

সবাই মিলে হুঙ্কার দিয়ে ঠেলে উঠলো—এত বড় স্পর্দ্ধা!……কিন্তু আশ্চর্য্য, কারো সাধ্য নেই যে নিজ নিজ আসন ছেড়ে উত্থিত হয়। ডিওনকে দেখা গেল তাঁর স্থূলদেহ নিয়ে তিনি পর্য্যঙ্ক থেকে উঠবার চেষ্টায় নানারূপ হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি করচেন—এ যেন এক রাত্রির দুঃস্বপ্ন। ……সন্ন্যাসী মৃদু হেসে বল্লেন—নিয়ারাকে আমি কন্যার মত দেখি, মা বলে সম্বোধন করি। ওর পারলৌকিক উন্নতির জন্যে আমি দায়ী। তোমাদের মত সুরাসক্ত লম্পট ওকে অধঃপতনের পথে নিয়ে চলেচ। তোমাদের সাবধান করে দিয়ে গেলাম। এর পরেও যদি এসো, বিপদে পড়ে যাবে। পরে ন্যানিফাসের দিকে চেয়ে বল্লেন—শোনো, তোমার দিন আসন্ন! এই সুরা ও নারী তোমাকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যাবে। পরকালের কথা চিন্তা কর। এখন থেকে পাঁচ মাসের মধ্যে একটি প্রশস্ত রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী পুরাতন কূপে তোমার মৃতদেহ ভাসচে আমি দেখতে পাচ্চি—

ন্যানিফাসের মুখ হঠাৎ বিবর্ণ, পাণ্ডুর হয়ে উঠলো। সুরার নেশা ততক্ষণ তার এবং সকলেরই কেটে গিয়েচে।

—আর ডিওন, তোমার বংশে একটি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আসন্ন। কিন্তু সেজন্যে তুমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিও—বিদায়।……আমি চলে গেলে তোমরা পূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত হবে—বিদায়!……

সন্ন্যাসী অন্তর্দ্ধান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই নিজ নিজ অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হ'লেন। দোরের কাছে নিয়ারা দাঁড়িয়ে, তার মুখে মৃদু হাস্য।

ডিওন বল্লেন—কি ?

গ্যানিফাস বল্লে—কি ?

অন্য সবাই বল্লে—কি ?

নিয়ারা নিরুত্তর। একটি দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মতই অতি ক্ষীণ একটি হাস্যরেখা তার ওষ্ঠপ্রান্তে মিশে রইল।

২

শরৎ ঋতু শেষ হয়েচে, প্রথম হেমন্তের সুশীতল বাতাস গত গ্রীষ্মদিনগুলির দাবদাহ স্মৃতিতে পর্য্যবসিত করে তুলেচে। হেলিওডোরাস মালবে আজ মাস দুই ফিরে এসেচে। রাজধানী বিদিশার উপকণ্ঠে একটি বৃহৎ উদ্যানবাটিকা দূর থেকে তার বড় ভালো লাগে। প্রাচীন অশোক, বকুল, বট, নাগকেশর ও সপ্তপর্ণ তরুশ্রেণীর নিবিড় ছায়ায় উদ্যানটি যেন নিভৃত তপোবনের মত শান্তিপ্রদ ও মনোরম। কত পক্ষিকুলের সমাবেশ ও বিচিত্র কলতানে ছায়াবিতানগুলি যেন মুখর।

কয়েকদিন সেদিকে সে একাই গ্রীক রথ হাঁকিয়ে বেড়াতে যায়। টাঙা-জাতীয় এই গ্রীক যানগুলির চলন তক্ষশিলা এবং প্রায় সর্ব্বত্র সভ্য সভ্য নগর-নগরীতে দেখা যায় আজ-কাল। স্প্রিং নেই, বড় একটা কাঠের বা লোহার খুরোর ওপরে শকটের যতটুকু বসানো,—তাতে বড় জোর দুজন লোকের স্থান সঙ্কুলান হতে পারে। একদিন সে কি ভেবে প্রাচীরের একটি নিম্নস্থান উল্লম্ফন করে উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করলে। উদ্যান তো নয় যেন নিবিড় বন। বহুকালের উদ্যান, বড় বড় গাছগুলিতে নিভৃত কোণ ও ছায়া রচনা করেচে নানাস্থানে —পাষাণ-বাঁধানো বাপীতটে সুন্দর লতাগৃহ, অশোককুঞ্জ, উৎস, যক্ষমূর্ত্তি ইত্যাদি দ্বারা শোভিত নির্জ্জন উদ্যানের মধ্যে কিছু দূরে প্রাচীন দিনের ভারতীয় স্থাপত্য-প্রণালীতে নির্ম্মিত একটি বিশাল অট্টালিকা বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে দিয়ে চোখে পড়ে—কিন্তু সেখানে কেউ বাস করে বলে মনে হ'ল না। হেলিওডোরাস আপন মনে পরিভ্রমণ করতে করতে একটি পাষাণবেদীতে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলে—তারপর সেখান থেকে বের হয়ে এসে রথ হাঁকিয়ে চলে এল। সেই থেকে মাঝে মাঝে উদ্যানটিতে যায়—কখনও মধ্যাহ্নে, কখনও সন্ধ্যায়, কখনও একাই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে!

বৎসর প্রায় ঘুরে গেল। শীত এল, চলেও গেল। পুরুষপুরে এবার তুষারপাতের সংবাদ পাওয়া গিয়েচে—অতি দুর্দ্দান্ত শীত দিন এবার! ফাল্গুনী চতুর্দ্দশী তিথির মনোরম জ্যোৎস্না-লোকে, অজস্র বিহঙ্গকাকলী ও পুষ্পপর্য্যাপ্তির মধ্যে হেলিওডোরাসের দিনগুলি যেন স্বপ্নের মত কাটচে—রাজকার্য্যের অবসানে নিজের রথটি নিয়ে বার হয়ে নগরীর বাইরে বহু দূর পর্য্যন্ত চলে যায়। এখানে সে প্রায় একা, তবে দু'একটি ভারতীয় কর্ম্মচারীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েচে এবং

মালবের ভাষা সে একরকম আয়ত্ত করে ফেলেচে এক বৎসরে।

এই সময়ে একদিন সে তার সেই পরিচিত উদ্যানবাটিকাতে ঢুকলো পথের পাশে রথ থামিয়ে। পুষ্পে পুষ্পে, নববল্লীপল্লবে, চূতমুকুলের সুবাসে, কোকিল-ঝঙ্কারে, প্রাচীন উদ্যান তার বৃদ্ধত্ব পরিহার করে নবযৌবনের রূপ পরিগ্রহ করেচে, নিভৃত লতাগৃহ যেন গ্রীক রতি-দেবতার আসন্ন পাদস্পর্শের আগ্রহে উৎসববেশে সজ্জিত হয়েচে। সেই পাষাণবেদীতে সে মুগ্ধ মনে চুপ করে বসে আছে, এমন সময় কার পদক্ষেপের শব্দে চমকে পিছন ফিরে যা দেখলে তাতে সে বিস্মিত ও বিচলিত হয়ে উঠলো।

একটি রূপসী তরুণী তার পিছনে কিছুদূরে দাঁড়িয়ে। অপূর্ব তার অঙ্গলাবণ্য, ক্ষীণ কটি-তটে রক্তমেখলা, নিবিড় কৃষ্ণ কেশপাশে টাটকা তোলা যূথীগুচ্ছ, গ্রীক মেয়েদের মত দীর্ঘদেহা অথচ তন্বী। মেয়েটি অবশ্য ভারতীয়া, সাজপোশাকেই হেলিওডোরাস বুঝল।

মেয়েটিও তাকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েচে মনে হ'ল হেলিওডোরাসের। বিস্ময়ে তার চারু আয়ত কৃষ্ণ নেত্রদুটি স্তব্ধ অচঞ্চল। কিছুক্ষণ দু'জনের কেউ কথা বল্লে না।

তারপর হেলিওডোরাস উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে—ভদ্রে, এ উদ্যান বোধ হয় আপনাদের। আমি পথিক, বেড়াতে এসে একটু বসেছিলাম—

মেয়েটি কোন কথা না বলে ফিরে যেতে উদ্যত হ'ল।

হেলিওডোরাসের মূঢ়তা ততক্ষণ ঘুচেছে। সে হাজার হলেও গ্রীক ভদ্রলোক। বিনীত স্বরে বল্লে—একটু দাঁড়াবেন দয়া করে? আমার এই অনধিকার প্রবেশের জন্যে আমি বিশেষ লজ্জিত—আমায় যদি ক্ষমা করেন—

মেয়েটি যেন কম্পিত অগ্নিশিখা, নিজের মহিমায় নিজে দীপ্তিমতী। হেলিওডোরাস এই ভারতীয় মেয়েটির অপরূপ রূপমাধুরীতে কেমন বিস্মিত হয়ে উঠেচে। এত রূপ হয় এদেশের মেয়ের? এমন শ্বেতাঙ্গ সুন্দর দেহকান্তি যে-কোনো সুন্দরী গ্রীক তরুণীর পক্ষেও দুর্ল্লভ।... মেলিবিয়া কোথায় লাগে!

হেলিওডোরাস সসঙ্কোচে তার কথা শেষ করবার অতি অল্পক্ষণ পরেই মেয়েটি নম্রস্বরে বল্লে—আপনি কি গ্রীক্?

—হাঁ, ভদ্রে—

—অল্প দিন এসেচেন এখানে?

—না ভদ্রে। এক বৎসর হ'ল—আমি রাজসভায় তক্ষশিলার গ্রীক দূত—আমার নাম হেলিওডোরাস—

রূপসী বালিকা বিস্ময়ে কৃষ্ণ ভ্রূযুগল ঊর্দ্ধদিকে ঈষৎ তুলে হেলিওডোরাসের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—ও!.....

—কেন? আমার কথা কি আপনি শুনেছিলেন?

—হাঁ। বাবার মুখে শুনেছিলাম সভায় একজন রাজদূত—

হেলিওডোরাস মনে মনে ভাবলে, ইনি বোধ হয় কোনো রাজ-অমাত্যের কন্যা হবেন।

বল্লে—আপনার পিতা রাজসভায় কি পদে—আমি অনেককেই চিনি—

মেয়েটি কিছু বলবার পূর্ব্বেই আরও দুটি সুন্দরী মেয়ে—ওরই প্রায় সমবয়সী—সেখানে এসে পড়লো কোথা থেকে। ওদের দু'জনকে দেখে তারাও যেন অবাক্ হয়ে গিয়েচে। একজন বল্লে—কত খুঁজে বেড়াচ্চি তোমাকে—বাবাঃ—এখানে কি হচ্চে?

মেয়ে দুটি বিস্ময়ের দৃষ্টিতে হেলিওডোরাসের দিকে চাইলে। সে দৃষ্টির মধ্যে প্রশ্নও ছিল।

হেলিওডোরাস বল্লে—আমি এখানে বেড়াতে এসে একটু বসেছিলাম। আমি জানতাম না যে, আপনাদের বাগান। সেই সময় আপনাদের সখী—

মেয়ে দুটি সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে তাদের সখীর দিকে চেয়ে বল্লে—চলো। মহাদেবী ভাববেন—কতক্ষণ বেরিয়েচি—

এমন সময় আরও তিন-চারটি তরুণী সেখানে এসে দাঁড়ালো। তাদের পেছনে দেখা গেল আরও দুটি আসচে। পেছনের মেয়েগুলি কলরব করতে করতে আসছিল। ওদের মধ্যে কে বল্লে—কি হচ্চে সব জটলা ওখানে? কি হয়েচে?

নববসন্তের বাতাস যেন মদির হয়ে উঠেচে, ওদের সম্মিলিত কণ্ঠের তরল হাস্যকলরবে চূতমঞ্জরী এই পুষ্পলাবণী তন্বী বালিকাদের নূপুর-নিক্কণে।

হেলিওডোরাস প্রথমদৃষ্টা সেই অপরূপ রূপসীকে সম্বোধন করে বল্লে—আমি চলে যাচ্চি, আমায় ক্ষমা করুন—আপনার পিতার নামটি তো শুনতে পেলাম না ভদ্রে?

একজন মেয়ে ভালো করে মুখ না ফিরিয়েই ঈষৎ উদ্ধত স্বরে বল্লে—ওঁর পিতার নাম মহারাজ ভাগভদ্র।

তারপর সবাই মিলে একদল বনহংসীর মত লঘু পদক্ষেপে লতাবিতানের অন্তরালে অদৃশ্য হ'ল।

হেলিওডোরাস কোনরকমে বাগান থেকে বার হয়ে এল।

স্বয়ং রাজকন্যা মালবিকা! এঁর রূপের খ্যাতি বিদিশায় এসে পর্য্যন্ত সমবয়সী দু'একজন বন্ধুবান্ধবের মুখে সে যথেষ্ট শুনে এসেচে। নগরচত্বরে ভ্রমণশীল অনেক মেয়েকে দেখে মনে হয়েচে, রাজকন্যা কেমন রূপসী? এই রকম?

আজ এভাবে···

আশ্চর্য্য! কিন্তু—

হেলিওডোরাসের মাথার মধ্যে কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্চে। উঃ কি গরম আজ! বিশ্রী জায়গা এই বেশনগর। এমন গরমে মানুষ টেঁকে?

অপূর্ব্ব রূপসী এই রাজকন্যা মালবিকা। অপূর্ব্ব···অপূর্ব্ব···অপূর্ব্ব—দেবী মিনার্ভার মত মহিমময়ী, এ্যাফ্রদিতির মত লাস্যময়ী, রূপবতী, সাক্ষাৎ রতিদেবী, এ্যাফ্রদিতি, মূর্ত্তিমতী প্রণয়-কবিতা, সাফোর বহ্নিজ্বালাময়ী প্রেমের কবিতা—সাফোর—

আরও এক মাস কেটে গেল। গ্রীষ্মকাল এসে পড়েচে। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা মাথায় করে ঝাঁকে ঝাঁকে খরমুজা বিক্রী করতে আনচে বাজারে। এই একমাস কি কষ্টে যাপন করচে হেলিওডোরাস সে-ই জানে। কাউকে বলতে পারেনি যে তার সঙ্গে রাজকন্যা মালবিকার দেখা হয়েছিল, কে কি মনে করবে, কার কানে কি কথা উঠবে। এ-সব হিন্দুরাজ্যের আইনকানুন বড় কড়া—কথায় কথায় প্রাণদণ্ড। মৃত্যুকে সে ভয় করে না—কিন্তু নির্ব্বোধের মত মৃত্যুকে ডেকে আনার দরকার কি?…সেইদিনটি থেকে তার শয়নে স্বপনে রাজকন্যা মালবিকা। কতবার সেই উদ্যানের আশেপাশে বেড়িয়েচে…দু'দিন প্রাণ তুচ্ছ করে ঢুকেও ছিল, সেই পাষাণবেদীতে গিয়ে বসেছিল, কিন্তু সে উদ্যান যেমন সে-দিনটির পূর্ব্বে ছিল জনহীন, তেমনি তখনও। অবহেলিত উৎসমুখ, ভগ্ন যক্ষমূর্ত্তি, বনজঙ্গলে সমাচ্ছন্ন পুষ্পবাটিকা, লতাগৃহ…শৈবালাচ্ছন্ন পাষাণ-প্রাসাদ…জনশূন্য অলিন্দ…কিন্তু হেলিওডোরাস আর বাঁচে না…সত্যিকার প্রেম জীবনে এই প্রথম এসেচে তার বহ্নিজ্বালা নিয়ে। জীবনে আর সব কিছু তুচ্ছ হয়ে গিয়েচে …আর একটিবার সেই অপরূপ রূপসী তরুণী দেবীর সঙ্গে দেখা হয় না? সব কিছু দিয়ে দিতে পারে হেলিওডোরাস…একটিবার চোখের দেখা…সব দিক থেকে অসম্ভব…সে সামান্য রাজদূত, কর্ম্মচারী মাত্র—তাতে বিদেশী, বিধর্ম্মী…অন্যদিকে প্রবলপ্রতাপ মহারাজ ভাগভদ্রের কন্যা সে…

বৈশাখের শেষের দিকে গ্রীষ্মের দাবদাহ আরও বেড়েচে, হেলিওডোরাস কি মনে করে অপরাহ্নের দিকে সেই উদ্যানবাটিকাতে যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করতে করতে গিয়ে হাজির হ'ল। পক্ক আম্রফলের গন্ধ—বৈশাখ-অপরাহ্নের উষ্ণ বাতাসে। সেই পাষাণবেদীতে আগেকার আর দু'বারের মত এবারও বসলো। দু'বার নিষ্ফল হয়েচে এই বৃথা প্রতীক্ষা, এবারও হবে সে জানে। তা নয়, সেজন্যে সে আসে নি—কিন্তু এই লতাগৃহের বাতাসে যেন তার দেহগন্ধ মিশিয়ে আছে—পক্ক আম্রফলের গন্ধ যেমন মিশে রয়েচে এই নিদাঘ-অপরাহ্নের বাতাসে। সে স্বপ্ন দেখতে চায়—ভাবতে চায়—কোথায় কোন্ সুখী প্রেমিক যুগল এমনি জনহীন নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় পরস্পরের হাত ধরে যূথীবনে বিচরণশীল—কত কথা, কত প্রণয়-গুঞ্জন, কত চুম্বন উভয়ের মধ্যে,—সে আর রাজকন্যা মালবিকা।…এমন যদি কোনদিন—

ভাবতে ভাবতে বোধ হয় তার তন্দ্রাকর্ষণ হয়ে থাকবে। গরম তো বটেই…

হঠাৎ যেন একটি সুন্দর হাস্যমুখ কিশোরমূর্ত্তি তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে তাকে এক ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে তুলে বল্লে—আমি কতকাল অপেক্ষা করবো তোমার জন্যে? ওঠো, ওঠো—

কত এলোমেলো স্বপ্ন থাকে মাথায়।

হেলিওডোরাস জেগে উঠলো। বেদীর গায়ে তার খড়্গখানা ঠেকানো রয়েচে, হাতে নিয়ে বাগানের বাইরে তার রথের কাছে এল।

সত্যিই সে উদ্‌ভ্রান্ত, এমন অবস্থায় সে বেশিদিন এখানে কাটাতে পারবে না। পাগল হয়ে যাবে নাকি শেষে?

পথে পা দিতেই একটি বৃদ্ধ ভিক্ষুক ওর কাছে ভিক্ষা চাইলে। ও অন্যমনস্কভাবে কিছু মুদ্রা ওর হাতে দিতে গেল—দেখলে, সেটি একটি স্বর্ণমুদ্রা—ফিরিয়ে নিতে যাবে, কিন্তু পরক্ষণেই অপরিসীম ঔদাসীন্যের সঙ্গে মুদ্রাটি ভিক্ষুকের হাতে ফেলে দিলে। কি হবে অর্থ তার জীবনে? নীরস জীবন, মরুময় জীবন। পিতা ডিওন সুখে থাকুন, কিন্তু তাঁর বংশের পাপ—প্রজাদের অর্থশোষণ, তাদের উপর অত্যাচার—

ভিক্ষুক স্বর্ণমুদ্রা হাতে পেয়ে অপ্রত্যাশিত আনন্দে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলো—বাসুদেব আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন—

হেলিওডোরাসের অন্যমনস্কতা এক চমকে কেটে গেল। বল্লে—কি বলচিস তুই? এই দাঁড়া—

ভিক্ষুক ভয়ে ভয়ে বল্লে—খারাপ কিছু বলি নি বাবা, বাসুদেব আপনার মনের বাসনা পূর্ণ করুন, তাই বলচি—

—কে তিনি?

—মস্ত বড় মন্দির বাসুদেবের—জানেন না?

—খুব জানি। কেন জানবো না—ভারতীয় দেবতার মন্দির। দেখেচি—

—তিনি যে জাগ্রত দেবতা বাবা, যে যা ভেবে মানত করে, তিনি তার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করেন। আমি একবার—

হেলিওডোরাস আর একটি মুদ্রা তার হাতে দিয়ে বল্লে—যা পালা—মুণ্ডু কেটে ফেলে দেবো, আর একটি কথা বল্লে—

সেই বৈশাখী জ্যোৎস্নারাত্রে উদ্‌ভ্রান্ত হেলিওডোরাসের মনে ভিখিরীর এই কথা যেন দৈববাণীর আশ্বাস নিয়ে এলো। বাসুদেব···ভারতীয় দেবতা বাসুদেব···

মনের বাসনা পূর্ণ হবে তার? সে যা চায়? মালবিকাকে না পেলে বিশাল ইরিথ্রিয়ান সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ছাগপদ বনদেবতাদের খুঁজে বের করবে সামোস দ্বীপের বন্য দ্রাক্ষাকুঞ্জের নিভৃত আশ্রয়ে, জলপাই ও মার্টল বৃক্ষের ঝোপে ঝোপে আর্দ্র পাষাণমঞ্চে শুয়ে ওক পাইনের তলে সারাজীবন কাটিয়ে দেবে বন্যফল খেয়ে—ছাগপদ স্যাটিরদের দলে মিশে চিরযৌবনা বনদেবীদের সন্ধানে···অথবা, বনদেবীদের প্রয়োজন নেই···রাজনন্দিনী মালবিকার সন্ধানে সে চিরযুগ ঘুরবে—

পরদিন বৈশাখী পূর্ণিমা। সন্ধ্যার সময় সে গিয়ে বাসুদেবের মন্দিরের বিশাল চত্বরের একপাশে এক গাছতলায় দাঁড়ালো। বিরাট পাষাণমন্দিরের চূড়া ঊর্দ্ধাকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে—মন্দিরের অভ্যন্তরে শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি—মন্দিরের প্রাঙ্গণে শত শত নরনারীর ভিড়—স্থানে স্থানে পুষ্পবিক্রেতা বসে আছে নানা বর্ণের পুষ্পের ডালি সাজিয়ে, দলে দলে মেয়েপুরুষ চলেছে মন্দিরে। সে জানে তাকে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করতে হয়তো বাধা দেবে। তবুও সে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লো সন্ধ্যার অন্ধকারে গা মিশিয়ে। বেশি দূর যেতে

সাহস হ'ল না কিন্তু।

দূর থেকে দেখা গেল গর্ভদেউলের অন্ধকারে ধাতুপ্রদীপের আলোয় বাসুদেবের প্রস্তর-মূর্ত্তির মুখ। কোথায় যেন সে এ মুখ দেখেছে, ঠিক মনে করতে পারলে না। কোথায়?··· কবে?

অন্য লোকের দেখাদেখি হাত জোড় করে প্রার্থনা করলে—হে বাসুদেব, আমি বিদেশী, বিধর্ম্মী। তোমার কাছে এসেচি। তুমি নাকি মানুষের মনের বাসনা পূর্ণ কর। আমার মনের বাসনা তুমি জানো, আমি অন্য ধর্ম্মের লোক বলে তুমি আমার প্রার্থনা অবহেলা করতে পারবে না কিন্তু। আমার নাম হেলিওডোরাস—তক্ষশিলায় আমার বাড়ী। মনে করে রেখো—

বাসুদেবের বিশাল মন্দিরের পাষাণচুড়া বৈশাখী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেচে। নরনারীর ভিড় ক্রমশই বাড়চে—হয়তো এখানে আজ কোনো উৎসব আছে। নরনারীদের মধ্যে কেউ কেউ তার দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে গেল—হয়তো ভাবলে একজন গ্রীক যুবক বাসুদেবের মন্দিরে কি করচে?

একটি লোককে দেখে হেলিওডোরাস তাকে ডাক দিলে। লোকটি ছুটে এল তার কাছে, তার গলায় উপবীত, কপালে চন্দনের ফোঁটা, শিখায় পুষ্প বাঁধা।

হেলিওডোরাসের অনুমান যথার্থ, সে মন্দিরের একজন পরিচারক ব্রাহ্মণ বটে।

লোকটিকে সে বল্লে—কত লাগে তোমাদের দেবতাকে কিছু ফলমূল মিষ্টান্ন কিনে দিতে?

একজন গ্রীকের এত ভক্তি দেখে বোধ হয় লোকটি একটু অবাক্ হয়ে ওর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—আপনি কি পূজো দেবেন?

—হ্যাঁ।

—যা দেবেন আপনি। দু দীনার, দশ দীনার—

—তক্ষশিলার স্বর্ণমুদ্রা এখানে চলবে?

—কেন চলবে না হুজুর? শ্রেষ্ঠীর দোকানে ভাঙিয়ে নিলেই চলবে—

—আচ্ছা নিয়ে যাও। আমার নাম হেলিওডোরাস, নাম মনে থাকবে? আমার নামে এই মুদ্রার পরিমাণ ফলফুল মিষ্টান্ন কিনে দেবে—কেমন তো?

—নিশ্চয়ই। বাসুদেবের নামে দিচ্চেন—আপনি দেখচি একজন ভক্ত।

—আচ্ছা যাও—

—আমার দক্ষিণাটা—

হেলিওডোরাস পূজারীকে আরও কিছু দিয়ে সেখান থেকে বার হয়ে মন্দিরের সিংহদ্বারের কাছে এল।

সেই দিনটির পর সে মাঝে মাঝে প্রায়ই বাসুদেবের মন্দিরে এসে একবার করে দেবতাকে তার প্রার্থনা জানিয়ে যায়। মাসের পর মাস চলে গেল, মন্দিরের দেবতা তার প্রার্থনা শুনলেন কই? কোথায় তার মানসীপ্রতিমা···যার জন্যে এত আকুল প্রতীক্ষা? কেবল হাঁটাহাঁটিই সার।

একদিন এই অবস্থায় মন্দির থেকে বাড়ী ফিরে দেখলে তক্ষশিলা থেকে দূত এসেচে রাজা এ্যান্টিআলকিডাসের সেনাপতি এ্যারিওস্টোসের পত্র নিয়ে। পত্র খুলে পড়লে, এক্ষুনি তাকে ফিরে আসতে হবে তক্ষশিলায়। জরুরী দরকার।

হেলিওডোরাস বিস্মিত হ'ল। দূতকে বল্লে—তুমি কিছু জানো?

সে ব্যক্তি বিশেষ কিছু জানে না। কোন গোপনীয় রাজকার্য্য হবে।

সেইদিনই হেলিওডোরাস তক্ষশিলায় প্রত্যাবর্ত্তন করলে। সেখানে গিয়ে শুনলে, ব্যাপার গুরুতর বটে। মধ্য-এশিয়া থেকে যুদ্ধদুর্ম্মদ শ্বেতকায় হূণদল গান্ধার আক্রমণ করে ভারতের দিকে অগ্রসর হচ্চে। তাদের অত্যাচারে গান্ধার ও কপিলার বহু গ্রাম জনপদ ধ্বংস হয়েচে, বহু নগরী বিধ্বস্ত হয়েচে। পুরুষপুর, বেণুপত্র, মাত্রাবতী, বলভী প্রভৃতি রাজ্য বিপন্ন। পুরুষপুরের গ্রীকরাজ হিরাক্লিয়াস ও বেণুপত্রের মহাসামন্ত কুব্জ বিষ্ণুবর্দ্ধন তক্ষশিলার সাহায্য প্রার্থনা করেচেন। রাজা সৈন্যদল পাঠাচ্চেন—হেলিওডোরাসকে যেতে হবে যুদ্ধে। হেলিওডোরাস আদেশ পেলে—সেনাপতি এ্যারিওস্টোস ও মহাসামন্ত কুব্জ বিষ্ণুবর্দ্ধনের অধিনায়কত্বে একদল সৈন্য 'চন্দ্রভাগা' পার হয়ে গান্ধারের দিকে অগ্রসর হচ্চে—ওদের সঙ্গে অবিলম্বে যোগ দিতে হবে।

তিন বছর কাটলো। আজ বলভী, কাল অন্যত্র, পরশু কপিলা। পর্ব্বত, প্রান্তর, নদী। গান্ধার থেকে পুরুষপুর, পুরুষপুর থেকে গান্ধার। শ্বেতকায় হূণেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত—অনেকবার তাদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ হ'ল মরুভূমিতে, পর্ব্বতের সংকীর্ণ অধিত্যকায়, কত গণ্ডগ্রামের রাজপথে। মানুষ ম'রে পাহাড় হয়ে গেল—যত না যুদ্ধে, তত দুঃখে কষ্টে অনাহারে। হূণের দল রক্তলোলুপ পশুর মত জনপদবাসীদের উপর অত্যাচার করতে লাগলো। রাত্রের আকাশ আলো হয়ে ওঠে দহ্যমান শস্যক্ষেত্রের বা গ্রাম-জনপদের বাসগৃহের রক্ত-অগ্নিশিখায়। মানুষ নৃশংস হত্যার লালসায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেচে। যুধ্যমান সৈন্যবাহিনীর নির্ম্মম রথচক্রতলে শত শত নিরীহ নারী, শিশু, অসহায় বৃদ্ধ পিষ্ট হয়ে মেদরক্তে পথের ধূলি কর্দ্দমাক্ত করে তোলে। সর্ব্বগ্রাসী প্রলয়দেব করাল কৃপাণ দু'হাতে বন্ বন্ করে ঘোরান—শাণিত খড়্গের ফলকে ফলকে সূর্য্যকিরণ ঠিকরে পড়ে। কপিলার উত্তর ভাগ শ্মশান হয়ে গেল এই তিন বৎসরে। গভীর নিশীথে সেখানে মুণ্ডমালিনী করালিনী কালভৈরবীর রক্তসিক্ত জিহ্বা লক্‌লক্ করে অন্ধকারে। শিবাদলের অমঙ্গল চীৎকারে অন্তরাত্মা কাঁপে।

একটি খণ্ডযুদ্ধে হেলিওডোরাস হূণদের হাতে বন্দী হ'ল। কেন তারা তাকে হত্যা করলে না, সে নিজেই জানে না···অবাক হয়ে গেল সে। পশুচর্ম্মের তাঁবুতে উটের দুধ ও ছাতু খেয়ে পর্য্যুষিত পশুমাংস খেয়ে সে এক মাস অতি কষ্টে কাটালো। প্রতিক্ষণেই মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে—অথচ কেন তাকে ওরা মারে না কে জানে? একদিন সে শুয়ে আছে তাঁবুতে,

স্বপ্ন দেখলে এক সুন্দর তরুণ তাকে ঠেলা মেরে উঠিয়ে বলচে—আমার সঙ্গে এসো আমি তোমায় পথ দেখিয়ে দিচ্চি পালাবার—

বাইরের অন্ধকার ছুরি দিয়ে কাটা যায়। এখানে ওখানে হূণ-প্রহরীদের অগ্নিকুণ্ড। আব্‌ছায়া অন্ধকারে চলেচে দুজনে, তরুণ আগে—ও পিছনে। পথপ্রদর্শক তরুণের মূর্ত্তি অন্ধকারে অস্পষ্ট, ভালো দেখা যায় না। সম্মুখেই অজিরাবতী নদী···

—নামো নামো, জলে নামো। মাভৈঃ—

স্বপ্নাচ্ছন্নের মত নামচে হেলিওডোরাস। কন্‌কনে বরফগলা জল, প্রথমে একহাঁটু, পরে কোমর, তারপরে একগলা।

আগে যে যাচ্ছে, সে বলচে,—ভয় নেই। চলে এসো। এই জায়গায় নদীর জল কম, চিনে রাখো এই শালগাছ। ডুবে যাবে না।

একগলা জলে পড়তেই হেলিওডোরাসের ঘুম ভেঙে গেল···ভোর হয়েচে। স্বপ্নের কথা সে ভাবলে। কে এই কিশোর? এ'কে সে কোথাও আরও স্বপ্নে দেখেচে—পরিচিত মুখ। হঠাৎ মনে পড়লো—সেই বিদিশার প্রাচীন উদ্যানবীথি···সেই বাপীতট (স্বপ্নযোগে উদ্‌ভ্রান্ত সে এক দিন এ'কেই দেখেছিল।)—কেন সে বার বার এই কিশোরকে স্বপ্নে দেখে? কে এই তরুণ?

সারাদিন সে স্বপ্নের কথা ভাবলে। তার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল, আজ রাত্রে সে পালাতে চেষ্টা করলে সে কৃতকার্য্য হবে। গভীর নিশীথে তাঁবুর বার হয়ে এল সে—হাতে পায়ে শৃঙ্খল ছিল না। আসবপানমত্ত হূণ-প্রহরীরা অগ্নিকুণ্ডের ধারে তন্দ্রামগ্ন। অদূরে অজিরাবতী নদী, ওই সেই শালগাছ। নিঃশব্দে জলে নেমে চক্ষের নিমেষে সে ওপারে উঠলো গিয়ে শালবনের মধ্যে কুজ বিষ্ণুবর্দ্ধনের স্কন্ধাবারে।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল সেই শীতকালের প্রথমেই। দীর্ঘকাল পরে হেলিওডোরাস তক্ষশিলায় ফিরলে। মাসখানেকের মধ্যেই রাজার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে মালবে সে পূর্ব্বপদে ফিরে এল। কিসের যেন আকর্ষণ, কে যেন টানে।

একদিন সে নগরীর বাইরে বেড়াতে বেড়াতে সেই উদ্যানবাটীতে প্রবেশ করলে। সেই শৈবালাচ্ছাদিত পাষাণবেদী, সেই লতাগৃহ, সেই যক্ষমূর্ত্তি-শোভিত বাপীতট—সব তেমনি আছে। যেন কতকাল আগের স্বপ্ন। একদিন সেই রূপসীকে যেন স্বপ্নে দেখেছিল এখানে—সেই বসন্তকালের পুষ্পসৌরভ, সেদিনকার সে সন্ধ্যাটি—সব যেন হিপোলিটাসের সেই করুণ কবিতাটি স্মরণ করিয়ে দেয়—'আপেলগাছের ছায়া, রূপসী-কণ্ঠের গান, সুবর্ণের দ্যুতি—' প্রথম যৌবনের হারানো দিনগুলির দূরাগত বংশীধ্বনি। হায় ভারতীয় দেবতা বাসুদেব! তোমার পাষাণ-দেউলের মত তুমিও কি কঠিন? কিংবা আমি গ্রীক বলে, বিধর্ম্মী বলে, আমায় অবহেলা করলে? কথা কানে তুললে না? সে আজ নেই। সে রূপসী কোনো দূররাজ্যের রাজমহিষী। জীবনে আর তার সঙ্গে দেখা হবে না, সে জানে। কেউ বলে নেই তার জন্যে তিন বৎসর পরে।

আবার বসন্তকাল। সুদীর্ঘ তিন বৎসর পূর্ব্বে এই বসন্তকালে এই সময় মালবিকার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। হেলিওডোরাস কি মনে ক'রে এবার ঠিক তেমনি প্রস্ফুটিত কুসুমগন্ধে আমোদিত পথ দিয়ে যেতে যেতে রথ থামিয়ে সেই উদ্যানটিতে প্রবেশ করলে। কতদিন এখানে আসেনি! সম্পূর্ণ বাস্তব এই পাষাণবেদী। স্বপ্ন তো নয়—বিশাল রাজপুরীর অন্তঃপুর-প্রান্তে সেই রূপবতী তরুণী রাজনন্দিনীও তো স্বপ্ন নয়। এখানে এসে তবুও যেন কেমন একটু স্পর্শ···একদিন এখানকার এই মৃত্তিকায় তো সে এসে দাঁড়িয়েছিল। আজ সে হয়তো বিবাহিতা—কোনো দূর রাজ্যের রাজমহিষী।

কতক্ষণ কেটে গেল। অপরাহ্ণ অবসান-প্রায়। বনলক্ষ্মী স্নিগ্ধ বাতাস কুসুমগন্ধে ভরে দিয়েছেন।

হিপোলিটাসের সেই কবিতা 'আপেলগাছের ছায়া, তরুণীকণ্ঠের গীতধ্বনি, সুবর্ণের দ্যুতি—'

হঠাৎ পাষাণ-বেদিকার পিছনে বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে কার পদধ্বনি শোনা গেল। তবে কি সেই কৃষ্ণকায় উদ্যানরক্ষক যাকে একবার সে কিছু পুরস্কার দিয়েছিল! মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখেই হেলিওডোরাস স্তব্ধ হয়ে রইল বিস্ময়ে, ঘটনার অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতায়। সেই অপরূপ রূপসী তরুণী স্বয়ং।

হেলিওডোরাস উঠে দাঁড়ালো। মেঘাবরোধ ছিন্ন করে বিদ্যুৎশিখা একেবারে তার সামনে—কতদিনের স্বপ্নে চাওয়া তার সেই মানসী প্রতিমা! দীর্ঘ তিন বৎসরে তার রূপ এতটুকু ম্লান হয়নি—বরং বেড়েচে।

তার চেয়েও আশ্চর্য্য, তরুণী তার দিকে চেয়ে হাসিমুখে বল্লে—ও, আপনি!

হেলিওডোরাসের ঘোর তখনও যেন কাটে নি—মাথা ও শরীর ঝিম্‌ঝিম্ করচে। সে উত্তর দিল, হাঁ ভদ্রে—

মেয়েটি বল্লে—আপনি অনেকদিন এদিকে আসেন নি—আপনি ছিলেন না এখানে তাও জানি। হূণদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। বীর আপনি। কিন্তু ফিরেছেন কবে তা শুনিনি।

হেলিওডোরাসের গ্রীক রক্ত শরীরের মধ্যকার শিরায় উপশিরায় আগুন ছুটিয়ে দিলে। সে স্থির দৃষ্টিতে তার প্রেমাস্পদার দিকে চেয়ে বল্লে—আমি ফিরে এসেচি এবং এই উদ্যানেও এসেচি কয়েকবার—কিন্তু আপনাকে দেখিনি—

মেয়েটি অবাক্ হয়ে বল্লে—আমাকে?

—আপনাকে খুঁজেচি যে—এই তিন মাস ধরে। গান্ধার থেকে ফিরে পর্য্যন্ত কতদিন এসেচি।

মেয়েটির মুখে যেন অতি অল্প সময়ের জন্য কিসের দীপ্তি, ওর শ্বেতপদ্মের আভাযুক্ত গণ্ডস্থল যেন অতি অল্প সময়ের জন্য রক্তিম হয়ে উঠলো—সে বল্লে—আচ্ছা, আমি শুনেচি, আপনি নাকি যুদ্ধে যাওয়ার পূর্ব্বে বাসুদেবের মন্দিরে যাতায়াত করতেন প্রায়ই—

—হাঁ, ভদ্রে—কে বল্লে ?

—সবাই বলে। আপনি গ্রীক, আপনার ওখানে যাতায়াত নিয়ে নগরীর লোকজনের মধ্যে একটা কৌতূহলের সৃষ্টি হবেই তো—আপনি কি আমাদের দেবতা মানেন ?

—মানি। আজ বিশেষ করে মানচি। বাসুদেব অতি দয়ালু দেবতা, মানুষের প্রার্থনা উনি শোনেন, আজ বুঝলাম।

মেয়েটি বিস্ময়ের সুরে বল্লে—আজ ? কেন ?

—আজই। অভয় দেবেন ভদ্রে ? মার্জ্জনা করবেন একজন বিদেশী লোকের প্রগল্‌ভতা ?

মেয়েটির মুখ হঠাৎ যেন বিবর্ণ হয়ে গেল, পরক্ষণেই সে-মুখে সাহস ও কৌতূহলের দীপ্তি ফুটে উঠলো—সেই সঙ্গে যেন লজ্জাও। মেয়েটি যেন আগে থেকে অনুমান করেচে—সে কি শুনবে এই রূপবান গ্রীক যুবকের মুখ থেকে।

হেলিওডোরাস বল্লে—ভদ্রে, আপনাকে আর একটিবার দেখবো এই প্রার্থনা করেছিলাম দেবতার কাছে।

মেয়ে রক্তিম মুখে চুপ করে রইল মাটির দিকে চেয়ে। কি দীপ্তিময়ী, মহিমময়ী মূর্ত্তি ! নিবিড় কৃষ্ণ কেশপাশে সেদিনকার মতই রক্তজবা ও যূথীগুচ্ছ। গ্রীবার কি অদ্ভুত ভঙ্গি !

হেলিওডোরাস বল্লে—আপনাকে না দেখলে বাঁচবো না। আমি এই তিন বৎসর উদ্‌ভ্রান্তের মত বেড়িয়েচি।

মেয়েটি প্রসন্ন হাস্যে বল্লে—কি হবে দেখে বলুন।

দেবী যেন জাগ্রতা হয়ে উঠেচেন—এই অদ্ভুত প্রসন্ন হাসির মধ্য দিয়ে অন্তরশয্যা থেকে সদ্য-জাগ্রতা প্রেমের ও করুণার দেবী যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠেচেন।

হেলিওডোরাস সহাস্যে বল্লে—শুধু দেখবো দেবী, আমার হৃদয়ের সমস্ত অর্ঘ্য—যদি কোনোদিন—

—এই জন্যে যেতেন আপনি বাসুদেবের মন্দিরে ? ঠিক বলচেন ?

—মিথ্যা বলিনি। কত পূজো দিয়েচি পূজারীদের হাতে—আর—

হেলিওডোরাস কুণ্ঠিত মুখে চুপ করে রইল।

—আর কি ?

—মনোবাসনা পূর্ণ হ'লে বাসুদেবকে মূল্যবান কিছু উপহার দেবো—।

রাজকন্যার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো। বাসুদেব ওর মূল্যবান উপহার পাবার প্রত্যাশা করেন কি না ! এই বিদেশী যুবক বড় সরল। মায়া হয় ওর ওপর।

মুখে বল্লেন মৃদু হেসে—তারপর বাসুদেবকে ভুলে যাবেন বুঝি ?

—জীবন থাকতে নয় দেবী, আপনি আর বাসুদেব এক তারে গাঁথা রইলেন আমার হৃদয়ে। দু'জনের কাউকেই ভুলবো না।

রাজকন্যা বল্লেন—একদিন আমরা বাসুদেবের মন্দিরে গিয়ে আপনাকে দেখি।

হেলিওডোরাস বল্লে—আমাকে ?

—মন্দিরের সিংহদ্বারের কাছে আপনি একজন পূজারী ব্রাহ্মণের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমি আমার সখীদের সঙ্গে মন্দিরে ঢুকচি—সুনেত্রা আমাকে দেখালে। সুনেত্রাকে ডাকি—

একটু পরে যে মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে রাজকন্যা ফিরলেন, তাকে প্রথম দিন হেলিওডোরাস এখানে দেখেচে।

সুনেত্রা এসেই হেসে বল্লে—আপনাকে আমরা কতদিন এখানে খোঁজ করেচি—আমার সখী—

রাজকন্যা তর্জনী তুলে শাসনের ছলে লজ্জারুণ মুখে বল্লেন—চুপ—সাবধান!

সুনেত্রা বল্লে—এখানে আর আসতেন না কেন? যুদ্ধে গিয়েছিলেন বুঝি?

—হ্যাঁ—কিন্তু ফিরে এসেও ত কতবার এসেচি ভদ্রে—রোজ রোজ তো আর পরের বাগানে আসতে পারি না?

সুনেত্রা ভ্রূকুঞ্চিত করে বল্লে—রোজ রোজ কি আমরা আপনার সন্ধান করতাম নাকি? আপনি দেখচি বড় ধৃষ্ট—যান এখান থেকে আজ। জানেন এটা আমাদের সখীর মাতামহ সঞ্জয়-দত্তের বাগান? নাৎনীকে দিয়ে গিয়েচেন তিনি। এ শুধু আমার সখীর নিজস্ব বাগান—কার অনুমতি নিয়ে আপনি এখানে ঢুকেচেন জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

রাজকন্যা সুকণ্ঠ প্রতিবাদের সুরে বল্লেন—ও কি সুনেত্রা!

পরে হাসিমুখে হেলিওডোরাসের দিকে চেয়ে বল্লেন—আমাদের যুদ্ধের গল্প শোনাবেন?

৬

হায় দেবতা এ্যাপোলো বেলভেডিয়ার! প্রতিদিন চতুরশ্বযোজিত রথে সারা আকাশ পরিভ্রমণ করে সন্ধ্যায় ফিরে আসেন নিজ গৃহে—আপনি দেখেন নি হেলিওডোরাসের দুঃখ··· ডিওন-পুত্র হেলিওডোরাসের? আপনি কি এখন আবার দেখচেন না, কত দুপুরে কত সুন্দর শরৎ ও শীতের অপরাহ্নে বিদিশার পূর্ব্বতন মহামাত্য সঞ্জয়দত্তের প্রাচীন উদ্যানবাটিকায় দুটি প্রেমিক হৃদয়ের গোপন লীলা-খেলা, শুনচেন না তাদের আনন্দগুঞ্জন? মাধবীপুষ্পমঞ্জরীর আড়ালে যার বিকাশ, উদ্যানবাটিকার অরণ্যছায়ায় তার ব্যাপ্তি—দুটি তরুণ হৃদয়ে সে সসঙ্কোচ প্রেম, বিচ্ছেদকালীন ব্যাকুলতা—দেখেন নি এ সব? না দেখেচেন না দেখেচেন, হেলিওডোরাস আর আপনাকে চায় না। দুঃখের দিনে যিনি কৃপা করে তার মনোবাসনা পূর্ণ করেচেন, সেই দেবতাই হেলিওডোরাসের একমাত্র উপাস্য। ভারতবর্ষের পবিত্র মৃত্তিকায় সেই দেবতার অপার করুণার এ ইতিহাস সে অক্ষয় ক'রে রেখে যাবে—যদি গ্রীক রক্ত তার দেহে থাকে।

একদিন মালবিকা বল্লে—হেলিওডোর, বাবাকে বলো—

—মহারাজ কি শুনবেন?

—তা হ'লেও তুমি বলো—গুপ্তভাবে আমাদের এমন সাক্ষাৎ আর বেশিদিন চলবে না।

—আমিও তোমাকে চাই মালবিকা—আমারও চলবে না তোমাকে না পেলে—

—সব হয়ে যাবে বাসুদেবের কৃপায়। চলো আজ দুজনে মন্দিরে যাই—তুমি একদিক থেকে, আমি অন্যদিক থেকে। মানত করে আসি তাঁর কাছে। তাঁর কৃপায় সব সম্ভব।

হেলিওডোরাস ইতিমধ্যে রাজসভায় যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেছিল নানাদিক থেকে। তক্ষশিলার প্রধান অমাত্যের পুত্র সে—উভয় রাজ্যের মধ্যে একটা মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় হয়ে উঠচে হেলিওডোরাসের রাজদূতরূপে উপস্থিতিতে। তরুণ দলের সে একজন নেতা—তার সুঠাম দেহকান্তি ও পুরুষোচিত ক্রীড়া ও ব্যায়ামনৈপুণ্যের জন্য তরুণ নাগরিকগণ তাকে অত্যন্ত মানে। তার ওপর হেলিওডোরাসের খ্যাতি রটে গিয়েছিল যে, সে গ্রীক হলেও বাসুদেবের একজন ভক্ত।…

নৃপতি ভাগভদ্র প্রথমে আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি হঠাৎ কেন এ বিবাহে সম্মতি দিলেন তা কেউ জানে না।

স্বয়ং মহারাণী পট্টমহাদেবী কুমারললিতা তার খবর রাখেন।

সেদিন নিশীথরাত্রে রাজা ঘর্মাক্ত-কলেবরে পর্য্যঙ্ক থেকে ধড়মড় করে ঘুম ভেঙে উঠলেন।

রাজ্ঞী ব্যস্তভাবে বল্লেন—কি হয়েচে গো, অমন করচো কেন?

—একটু জল দাও—উঃ কি ভীষণ—! জল দাও—

রাজ্ঞী স্বর্ণভৃঙ্গার থেকে জল দিয়ে বল্লেন—কি হয়েচে—কি হয়েচে—

নৃপতি এক দুঃস্বপ্ন দেখেচেন। এক চণ্ডপুরুষ তাঁর কাছে এসে এক বিশাল শূল আস্ফালন করে হুঙ্কার দিয়ে বলচেন…রে ভাগভদ্র, আমি কে চেনো? তোমার বংশের কুলদেবতা। হেলিওডোরাসের সঙ্গে তোমার কন্যার বিবাহে যদি সম্মতি না দাও—তবে তোমার মালবরাজ্য এই শূলের আগায় উড়িয়ে দক্ষিণ সমুদ্রে ফেলে দেবো—ও আমার জন্ম-জন্মান্তরের ভক্ত। বলেই সেই চণ্ডপুরুষ কি ভীষণ হুঙ্কার ছাড়লে!…শূলের অগ্রভাগ থেকে রক্ত অগ্নিশিখা যেন দাউ দাউ করে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়লো ঘরে ঘরে—উঃ, কি ভীষণ দুঃস্বপ্ন!

রাজ্ঞী বল্লেন—বেশ তো। হেলিওডোরাস সুন্দর ছেলেটি, তাকে আমি দেখেচি—মালবিকার সঙ্গে বড় সুন্দর মানাবে। তোমার মেয়েরও সম্পূর্ণ ইচ্ছে—

বল কি রাজ্ঞী! মেয়ে কি ওকে দেখেচে?

রাজ্ঞী হতাশার সুরে হাত-দুটি শূন্যের দিকে ছুঁড়ে বল্লেন—নির্ব্বোধ নিয়ে ঘর করা যায় তো অল্পবুদ্ধি নিয়ে ঘর করা চলে না—কথাতেই বলেচে। ওরা হ'ল আজকালকার মেয়ে—আর কি আমাদের মত সেকাল আছে? কোনো অমত কোরো না। হেলিওডোরাস আমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করবে বিয়ে হ'লেই, তুমি দেখো। আর ওরকম আজকাল তো হচ্চেই। তক্ষশিলায় আমার এক পিসতুতো বোনের ননদের যে একজন গ্রীক তালুকদারের সঙ্গে বিয়ে হয়েচে—

অতএব হেলিওডোরাসের সঙ্গে মালবিকার বিবাহে বাধা রইল না।

পিতা ভিওন পত্রবাহকের হাতে লিখে পাঠালেন—খুব সুখের কথা বাবা। আমি

তোমাকে এক পয়সা দিয়ে যেতে পারবো না। নিজের আখের যাতে ভাল হয় তাই করো। অর্থই গান্ধারের আপেল, কপিলার সুরা এবং কাশ্মীরী শাল। রাজকন্যাকে বিবাহ কর, ক্ষতি নেই, আখের দেখে নিও।

হেলিওডোরাসের সঙ্গে মালবিকার বিবাহের কয়েকদিন পরে রাত্রে গভীর সুষুপ্তির মধ্যে হেলিওডোরাস দেখলে, সেই নবীন সুন্দর কিশোর, তাকে ঘুমের মধ্যে ঠেলে দিয়ে আব্দারের সুরে অভিমানে রাঙা ঠোঁট ফুলিয়ে বলচে—আমার কথা মনে আছে? আমায় যা দেবে—কবে দেবে? মনে থাকবে?

হেলিওডোরাস চিনলে—দু-বৎসর পূর্ব্বে মহামাত্য সঞ্জয়দত্তের উদ্যানে এই কিশোরকে সে স্বপ্নে দেখেছিল—ভূণ-তাঁবুতে রাতের অন্ধকারে এ'কেই সে স্বপ্নে দেখে। একদিন মন্দিরে গিয়ে বিগ্রহের মুখ দেখে তার মনে হয়েছিল কোথায় যেন এ মুখ সে দেখেচে। আজ সে বুঝেচে—

হেলিওডোরাস বিস্ময়ে ও আনন্দে শিউরে উঠলো ঘুমের মধ্যে। ইনিই সেই পরম করুণাময় বাসুদেব! জয় হোক তাঁর। জয় হোক স্বপ্ন-বাসুদেবের! হেলিওডোরাস তোমাকে ভুলবে না।

হেলিওডোরাস ভোলেওনি।

দু-হাজার বছর মহাকালের বীথিপথের অস্পষ্ট কুজ্‌ঝটিকায় কোথায় মিলিয়ে গিয়েচে। বিদিশা নগরী ও তার বাসুদেবমন্দির আজ অতীতের ভগ্নস্তূপ—কিন্তু তার প্রাঙ্গণতলে পরম ভাগবত হেলিওডোরাসের বিশাল গরুড়-স্তম্ভ ভক্ত ও ভগবানের স্মৃতিচিহ্ন বহন করে আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।···ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।···